কৃষণ চন্দর

অন্নদাতা

বাংলার চেতাল্লিশের মন্বন্তরের কাহিনি

অন্নদাতা

কৃষণ চন্দর

অন্নদাতা

বাংলার তেতাল্লিশের মন্বন্তরের কাহিনি

উর্দু থেকে অনুবাদ

জাফর আলম

অন্নদাতা
গ্রন্থস্বত্ব © অনুবাদক
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৯, জানুয়ারি ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৪১৯, সেপ্টেম্বর ২০১২
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১২০ টাকা

Annadata
Bangla translation of *Andata* by Krishan Chandar
Translated by Zafar Alam
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 120 only

ISBN 978 984 90192 0 6

অনুবাদকের কথা

উর্দু সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক কৃষণ চন্দর। জীবদ্দশাতেই তিনি উর্দু কথাসাহিত্যের প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। উর্দু ছোটগল্পের আধুনিকায়ন এবং সেকেলে রচনারীতির ধারা থেকে বের করে এনে সাহিত্যের এই ধারাটিকে যোগ্যতার আসনে আসীন করতেও তিনি পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আজীবন সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী এই লেখক প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনেও রেখেছেন অগ্রণী ভূমিকা।

বাংলার তেতাল্লিশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মানবতার অবমাননা ও লাঞ্ছনা কৃষণ চন্দরের চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি লেখেন *অন্নদাতা* (অন্নদাতা)। তাঁর এই রচনা পরবর্তীকালে ধ্রুপদ সাহিত্যকর্মের মর্যাদা লাভ করে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময় কলকাতার ফুটপাতের অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষের চিত্র এঁকে বাংলাদেশের শিল্পী জয়নুল আবেদিন দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অন্নদাতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। প্রকাশক ছিল দিল্লির এশিয়া পাবলিশার্স। আমি গল্পটি মূল উর্দু গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি। যে সংস্করণ থেকে আমি অনুবাদ করেছি সেটি প্রকাশিত হয়েছিল পাকিস্তান থেকে, ১৯৭৯ সালে। প্রকাশক লাহোরের মাকতাবায়ে উর্দু। এই উপন্যাসিকায় মোট

তিনটি অধ্যায়—'হতভাগ্য লোকটি', 'যে লোকটি মারা গেছে' ও 'লোকটি এখনো মারা যায়নি'। *অন্নদাতা* নিয়ে হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

পাঠকের জন্য উপন্যাসিকার শুরুতে থাকল 'কৃষণ চন্দর: লেখকের প্রতিকৃতি'। **মন্বন্তর** নিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার অংশটি আমাদেরই নির্বাচন।

'মালঞ্চ', মিরপুর ৬
ঢাকা ১২১২

জাফর আলম

সূচিপত্র

কৃষণ চন্দর : লেখকের প্রতিকৃতি ৯

প্রথম অধ্যায়
হতভাগ্য লোকটি ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
যে লোকটি মারা গেছে ৩৫

তৃতীয় অধ্যায়
লোকটি এখনো মারা যায়নি ৪৭

কৃষণ চন্দর
লেখকের প্রতিকৃতি

কৃষণ চন্দরের জন্ম ১৯১৪ সালের ২৩ নভেম্বর, পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা জেলার উজিরাবাদে। তাঁর ছোট ভাই মহীন্দরনাথ একজন উর্দু কথাশিল্পী। তাঁর বোন সরলা দেবীও ছিলেন উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের খ্যাতিমান গল্প-লেখিকা।

কৃষণ চন্দর কাশ্মীরের মহশুরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এখানকার পুঞ্চ ভিক্টোরিয়া জুবিলি হাইস্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরে লাহোরের ফার্মন ক্রিশ্চান কলেজ থেকে এফএসসি পরীক্ষায় পাস করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ডাক্তার, সন্তানকেও তিনি ডাক্তারি পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষণ চন্দরের আকর্ষণ ছিল রাষ্ট্রবিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি। তাই তিনি বিজ্ঞান নয়, মানবিক বিষয়ে বিএ পাস করেন। ১৯৩৭ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে লাভ করেন এমএ, পরে এলএলবি ডিগ্রি। হাইস্কুলে তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষা পড়েছিলেন।

কৃষণ চন্দরের বাবা সরকারি চাকরি করতেন। তাঁর কাশ্মীরে চাকরি করার সুবাদে কৃষণ চন্দরের কৈশোর কেটেছে বিশ্বের সেই ভূস্বর্গে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সাহিত্যসাধনাকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে। এমএ পড়ার সময়ই নিজের কাঁধে তুলে

নিয়েছিলেন কলেজের ইংরেজি বিভাগের পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব। শিক্ষাজীবন শেষে কৃষণ চন্দর মাস কয়েক প্রফেসর সনৎ সিংয়ের সঙ্গে *নর্দার্ন রিভিউ* নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ফরিদা নামের এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে মিলে সম্পাদনা করেছিলেন *দ্য মডার্ন গার্ল* পত্রিকা। এর পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল। এই আন্দোলনের অভিঘাত কৃষণ চন্দরের জীবনকেও আলোড়িত করে। লাহোরে থাকতেই তিনি সমাজতান্ত্রিক দর্শনসংক্রান্ত বইপত্র পড়ে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে গড়ে তোলেন সম্পর্ক। জড়িয়ে পড়েন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এবং একবার ঝাড়ুদার সংঘের সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি যোগ দেন বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের দলে। সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর অভিযোগে দুমাস জেল খাটেন। বন্দী থাকেন লাহোর দুর্গে। তাঁর মনের গভীরে প্রোথিত তখন কেবল দুটি লক্ষ্য : এক. ইংরেজদের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করা; দুই. স্বাধীন সমাজতন্ত্রী ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

এই দুটি লক্ষ্য কৃষণ চন্দরের অন্তরে গেঁথে যায়। ফলে তাঁর প্রথম দিককার গল্পে এই আদর্শের ছাপ বেশ লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রথম গল্প 'য়্যারকাস' (পাণ্ডুরোগ) লাহোরের উর্দু সাহিত্য সাময়িকী *আদবি দুনিয়ায়* ছাপা হয়। কিন্তু তাঁর প্রকৃত সাহিত্যজীবন শুরু হয় 'ঝিলম মে নাওপর' (ঝিলামের বুকে নৌকায়) গল্পের ভেতর দিয়ে। এ গল্প প্রকাশের পর সাহিত্যজগতে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। তাঁর প্রথম উর্দু গল্প সংকলন *তিলসামে খেয়াল* ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের ওপর ভিত্তি করে

রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাসিকা *আন্‌দাতা*, এর বাংলা অনুবাদ এই *অন্নদাতা*।

কৃষণ চন্দর প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় প্রগতিশীল লেখক সংঘের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, কৃষণ চন্দর তাতে যোগ দেন। তাঁকে এ সময় এই সংগঠনের পাঞ্জাব শাখার সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

১৯৩৯ সালে কৃষণ চন্দর লাহোর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম সহকারী হিসেবে চাকরি নেন। এর আগে কিছুদিন তিনি শিক্ষকতাও করেন। তাঁর পেশা থেকে সাংবাদিকতাও বাদ যায়নি।

এক বছর পর তিনি লাহোর থেকে দিল্লিতে চলে আসেন। যোগ দেন অল ইন্ডিয়া রেডিও কেন্দ্রে। এখানে তাঁর সঙ্গে সাদত হাসান মান্টো ও খাজা আহমদ আব্বাসের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। এক বছর পর তাঁকে লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রে বদলি করা হয়। সেখানে তাঁকে নাটক বিভাগের প্রধান করা হয়। রেডিওতে কাজ করার সময় তিনি অনেক নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে *সরায়ে কে বাহের* (সরাইখানার বাইরে) সবচেয়ে বিখ্যাত। *সরায়ে কে বাহের* নাটকের কাহিনিকে পরে তিনি চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। *সাকি* পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত লেখক শাহেদ আহমদ দেহলভির অনুরোধে তিনি কাশ্মীরের একটি হোটেলে বসে মাত্র ২২ দিনে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *শিকস্ত* রচনা করেন। *শিকস্ত* উর্দু উপন্যাস সাহিত্যের মূল ভিত্তি বলে ইতিহাসে স্বীকৃত।

উল্লেখ্য, লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রের ধরাবাঁধা চাকরির সঙ্গে স্বাধীনচেতা ও অস্থিরমনা কৃষণ চন্দর বেশি দিন মানিয়ে চলতে পারেননি। চাকরি ছেড়ে তিনি পুনেতে চলে যান। সেখানে 'শালিমার পিকচার্স'-এর জন্য *মন কি জিত* ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্য রচনা করেন। ছবিটি বেশ সাফল্য অর্জন করে। পুনে

থেকে অচিরেই তিনি মুম্বাই চলে আসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ শহরেই ছিলেন। মুম্বাই এসে তিনি *সরায়ে কে বাহের* ও *দিল কি আওয়াজ* (হৃদয়ের ধ্বনি) নামে দুটি ছবি নির্মাণ করেন। কিন্তু দুটি ছবিই ফ্লপ করে। ফলে তিনি ছায়াছবি নির্মাণের ইচ্ছা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। সম্ভবত কৃষণ চন্দর সেই মুষ্টিমেয় কথাসাহিত্যিকের অন্যতম, যিনি কেবল গল্প ও উপন্যাস লিখে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বরে তাঁকে দেওয়া হয় 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার'।

১৯৫৯ সালের মে মাসে কৃষণ চন্দরকে মুম্বাইয়ে সাড়ম্বর সংবর্ধনা জানানো হয়। এ সময় তাঁর হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে। এর পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ঠিক একই সময় তাঁর ছোট ভাই মহীন্দরের আকস্মিক মৃত্যু এবং ছোট বোন সরলা দেবীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করে। এঁরা দুজনই ছিলেন তাঁর গভীর ভালোবাসার পাত্র। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই আঘাতের কষ্ট তিনি ভুলতে পারেননি। এরপর তিনি আবারও হৃৎ-আক্রমণের শিকার হন। আগেরটির চেয়ে দ্বিতীয় আক্রমণটি ছিল বেশি শক্তিশালী। ফলে তাঁর দেহে পেসমেকার বসানো হয়। মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পেসমেকারটি গরিব কোনো রোগীর দেহে বসানোর পরামর্শ দেন। এই মহান কথাশিল্পী ১৯৭৭ সালের ৮ মার্চ মুম্বাইয়ের একটি ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করেন।

কৃষণ চন্দরের প্রথম পত্নী দয়াবতী। এই ঘরে তাঁর তিন সন্তান—এক ছেলে, দুই মেয়ে। পরে তিনি উর্দু সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক সালমা সিদ্দিকিকে বিয়ে করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সালমা সিদ্দিকির সঙ্গেই কাটিয়েছেন।

কৃষণ চন্দর তাঁর ৬৩ বছর জীবনের প্রায় ৪০ বছরই উর্দু সাহিত্যচর্চায় নিবেদিত ছিলেন। মানবতার পক্ষে তিনি আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। সাদত হাসান মান্টো উর্দু ছোটগল্পকে যেখানে আধুনিকতার কাঠামোতে ঢেলে সাজিয়েছেন কৃষণ চন্দর সেখানে সাহিত্যের এই শাখাটিকে উদ্ভাসিত করেছেন মানবিক গুণাবলিতে। তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক। রচনা করেছেন সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্য। পাশাপাশি শিশুসাহিত্যও। ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত জিলানি বানু রচিত ও জ্যোতিভূষণ চাকী অনূদিত *কৃষণ চন্দর* নামের জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর রচিত উর্দু ছোটগল্পের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি, যা ২২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া লিখেছেন আটটি উপন্যাস, বিভিন্ন বিষয়ে ৩০টি গ্রন্থ এবং তিনটি রিপোর্টাজ। ভারতের প্রায় প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। বিশেষত, রাশিয়ায় তাঁর গ্রন্থের সমাদর সবচেয়ে বেশি। তাঁর অনেক বইয়ের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রাশিয়া, চীন, জাপান, ইংল্যান্ডসহ বেশ কিছু দেশ সফর করেছেন।

কৃষণ চন্দর লেখার মাধ্যমে আজীবন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত অংশ ছিল পুঁজিবাদের বিরোধিতা।

খুব খোশমেজাজি ও বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন তিনি। এমনিতে কথা কম বললেও পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। নিজে শৌখিন ছিলেন। দামি কাপড়চোপড় পরতেন, দামি কাগজে লিখতেন। ভালো খাবার খেতে ভালোবাসতেন। টাকাপয়সা খরচ করার ব্যাপারে ছিলেন বেপরোয়া। আর্থিক দুরবস্থায় কখনো কিছুটা

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও অবস্থা যখন ফিরত, তখন মনের আনন্দে দুহাতে খরচ করতেন।

কৃষণ চন্দর অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন। তিনি ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত ছিলেন। বিশ্বের নিপীড়িত সব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। নিজেকে তিনি নিপীড়িতদের একজন বলে গণ্য করতেন।

কৃষণ চন্দর বেঁচে থাকবেন উর্দু কথাসাহিত্যের জাদুকর হিসেবে, একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে।

'আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ;
বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দু'পাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,
পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে!
দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল;
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।'

সুকান্ত ভট্টাচার্য
'বিবৃতি', *ছাড়পত্র*

প্রথম অধ্যায়

হতভাগ্য লোকটি

[কলকাতা থেকে তাঁর দেশের ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার কাছে লেখা একজন বিদেশি রাষ্ট্রদূতের কয়েকটি চিঠি]

ক্লাইভ স্ট্রিট
মুন সাইন ভিলা
কলকাতা
৮ আগস্ট ১৯৪৩

জনাব,

সম্প্রতি আমি কলকাতা এসে পৌঁছেছি।

কলকাতা ভারতের সবচেয়ে বড় শহর। ভারতের সবচেয়ে আশ্চর্য নিদর্শন হাওড়া ব্রিজ। বাঙালি ভারতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় পতিতালয় কলকাতার 'সোনাগাছি'। কলকাতার অদূরে সুন্দরবন 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারে'র সর্ববৃহৎ বিচরণভূমি। সর্ববৃহৎ পাট ব্যবসা কেন্দ্রও কলকাতা। কলকাতার সবচেয়ে প্রিয় মিষ্টির নাম 'রসগোল্লা'। জনশ্রুতি আছে, একজন পতিতা নাকি এই মিষ্টি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই মিষ্টির 'পেটেন্ট' তিনি তাঁর নিজের

নামে রেজিস্ট্রি করতে পারেননি। কারণ, তখন ভারতীয় বিধিবিধানে তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই বুড়ো বয়সে পতিতা বেচারি পথে পথে ভিক্ষা করেই মারা যান। পৃথক একটি পার্শেল মারফত আপনাকে ২০০ রসগোল্লা পাঠাচ্ছি। মাংসের কিমার সঙ্গে খেতে অপূর্ব লাগবে। আমি নিজেও খেয়ে দেখেছি।

ইতি

আপনার একান্ত অনুগত সেবক

স্বাক্ষর—এফ বি পটাখা

রাষ্ট্রদূত সাইলোরিকা

ক্লাইভ স্ট্রিট

কলকাতা

৯ আগস্ট ১৯৪৩

জনাব,

আপনার মেজো মেয়ে এডিথ আমার কাছে একটি সাপুড়ের বাঁশি চেয়েছিল। আজ পথে একজন সাপুড়ের দেখা পেলাম। তার কাছ থেকে মাত্র এক টাকায় একটি সুন্দর বাঁশি কিনে রেখেছি। বাঁশিটি গ্রামে তৈরি। সুন্দর কারুকাজ করা আর স্পঞ্জের মতো পাতলা। ভারতীয় 'লাউ' নামের একধরনের সবজি থেকে হাতে তৈরি। খোলটিকে আমি পালিশ করেছি। একে রাখার জন্য আমি একটি সুন্দর বাক্স তৈরি করেছি। হুজুরের মেজো মেয়ে এডিথের জন্য উপহার হিসেবে বাঁশিটা পাঠাচ্ছি।

আপনার একান্ত অনুগত সেবক

স্বাক্ষর—এফ বি পটাখা

সাইলোরিকার রাষ্ট্রদূত

কলকাতা
১০ আগস্ট ১৯৪৩

জনাব,

আমাদের দেশের মতো কলকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা নেই। খাদ্যের ব্যাপারে প্রত্যেকের ষোলো আনা স্বাধীনতা রয়েছে। ওরা বাজার থেকে ইচ্ছেমাফিক শস্য কিনতে পারে। গতকাল টিল্লির রাজদূতের ভোজে দাওয়াত পেয়েছিলাম। আমাদের টেবিলে পরিবেশন করা হয়েছিল ২৬ পদের রান্না করা মাংস। তা ছাড়া ২৪ ধরনের তরিতরকারি, পুডিং ও সালাদ। পরিবেশন করা হয়েছিল সবচেয়ে সেরা মদ। আপনি জানেন, আমাদের দেশে এখন পেঁয়াজ থেকে শুরু করে গাজর ইত্যাদি ইচ্ছেমাফিক কেনা যায় না। ইংল্যান্ডে এখন সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত। কলকাতায় তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এ ব্যাপারে এখানকার লোকজন ভাগ্যবান।

এই ভোজসভায় একজন ভারতীয় প্রকৌশলীও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি আমাদের দেশে শিক্ষালাভ করেছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, কলকাতায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এই কথা শুনে টিল্লির রাষ্ট্রদূত অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, অবশ্য এই হাসিতে আমাকেও যোগ দিতে হয়। আসলে এই শিক্ষিত ভারতীয়দের মতো মূর্খ আর দ্বিতীয় কেউ নেই। পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া নিজের দেশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে তারা কোনো খবরই রাখে না।

ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ লোক দিনরাত সন্তান আর ফসল উৎপাদনে ব্যস্ত। তাই সেখানে খাদ্যশস্যের অভাব নেই। যুদ্ধের আগে বিপুল পরিমাণ ফসল বিদেশে রপ্তানি করা হতো এবং বড় হলে শিশুদের কুলি-মজুর হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হতো। কিছুদিন যাবৎ কুলি চালান দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে দেওয়া হয়েছে স্বায়ত্তশাসন।

আমার ধারণা, এই ভারতীয় প্রকৌশলী একজন মারাত্মক অতিবিপ্লবী। তিনি ভোজসভা ছেড়ে চলে গেলে তাঁর ব্যাপারে টিল্লির রাষ্ট্রদূত মি. জ্যান জ্যান ট্রিপকে বললাম। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে এই মত প্রকাশ করলেন যে, ভারতীয়রা নিজেদের দেশ শাসনের যোগ্যতা রাখে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মি. ট্রিপের সরকারের সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই তাঁর কথার বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে আমি পারি না।

আপনার একান্ত অনুগত সেবক
স্বাক্ষর—এফ বি পটাখা

১১ আগস্ট ১৯৪৩

আজ সকালে আমি বোলপুর থেকে ফিরে এসেছি। সেখানে ড. টেগোরের শান্তিনিকেতন দেখেছি। ওরা বলে, সেটা নাকি একটা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রদের বসার কোনো বেঞ্চ নেই। ব্যাপারটা থেকে সহজে অনুমান করতে পারেন, সেখানে কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়! ছাত্র-অধ্যাপকদের সবাই মাটিতে একসঙ্গে বসে ক্লাস করে থাকেন। ভগবান জানেন, তারা সত্যিই পড়াশোনা করে, নাকি বসে বসে শুধুই ঝিমায়। গরম ক্রমে বাড়তে থাকায় এবং গাছের ডালে চড়ুইয়ের কিচিরমিচির শুরু হওয়ায় আমি বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারিনি। চলে এসেছি।

ইতি
এফ বি পটাখা

১২ আগস্ট ১৯৪৩

আজ চীনা দূতাবাসে আহারপর্বের সময় একজন কলকাতার দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কী, কেউ বলতে পারেনি। আমরা এ সম্পর্কে বাংলা সরকারের বিবৃতির প্রতীক্ষায় আছি। যখন বিবৃতি প্রকাশিত হবে, আপনাকে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানাব। কূটনৈতিক কাগজপত্রের ব্যাগে আপনার মেজো মেয়ে এডিথের জন্য একজোড়া ভারতীয় জুতো পাঠালাম। জুতোটি সবুজ রঙের সাপের চামড়ার তৈরি। বার্মায় এই-জাতীয় অগুনতি সবুজ সাপ পাওয়া যায়। বার্মাদেশ আবারও ব্রিটিশদের দখলে এলে তখন এই জুতোর ব্যবসা দারুণভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

আপনার একান্ত
এফ বি পটাখা

১৩ আগস্ট ১৯৪৩

দূতাবাসের সামনে, এর চত্বরের বাইরে আজ দুজন মহিলার লাশ পাওয়া গেছে। তাদের অস্থি-চর্মসার দেহ দেখে মনে হয়, তারা 'রিকেট' রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। শুধু বাংলাদেশে নয়, বোধহয় সারা ভারতে এই রোগ সংক্রামক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এ এক আশ্চর্য আর মারাত্মক রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তি শীর্ণকায় হতে হতে অবশেষে মারা যায়। জানা গেছে, এই রোগের কোনো প্রতিকার নেই। কুইনাইন বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে; কিন্তু কোনো ফল দেয়নি। আসলে এশিয়ার গ্রীষ্মাঞ্চলের এইসব রোগ ইউরোপের রোগ-বালাইয়ের চেয়ে পুরোপুরি আলাদা। এতে প্রমাণিত হয় যে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই।

আপনার স্ত্রীর ৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে বুদ্ধের একটি প্রস্তরমূর্তি পাঠাচ্ছি। মাত্র ৫০০ ডলারে এটা কিনেছি। মহারাজা বিন্দুসারের যুগের এই মূর্তিটি বারাণসীর পবিত্র মন্দিরে ছিল। আশা করি এটা আপনার স্ত্রীর ড্রয়িংরুমের শোভা বর্ধন করবে।

বি. দ্রষ্টব্য—দূতাবাসের সামনে পাওয়া লাশের পাশে একটি শিশুকেও পাওয়া গেছে। শিশুটি মৃত মায়ের স্তন্য পানের ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। আমি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি।

আপনার একান্ত অনুগত খাদেম
এফ বি পটাখা

১৪ আগস্ট ১৯৪৩

অনাথ শিশুটিকে ডাক্তার হাসপাতালে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং এখন সে দূতাবাসেই আছে। কী করব বুঝতে পারছি না। জনাবের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। শিশুটিকে যেখানে পাওয়া গেছে, টিল্লির রাষ্ট্রদূত তাকে সেখানেই রেখে আসতে পরামর্শ দিয়েছেন; কিন্তু সরকারের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া আমার এমন কিছু করা যুক্তিসংগত হবে না।

এফ বি পটাখা

১৬ আগস্ট ১৯৪৩

দূতাবাসের বাইরে আরও অনেক লাশ দেখা গেছে। আগের চিঠিতে উল্লেখ করা সেই একই রোগে এরা আক্রান্ত বলে মনে হয়।

চুপিসারে আমি শিশুটিকে মৃতদেহগুলোর মধ্যে রেখে পুলিশকে ফোন করে বলে দিই যেন অবিলম্বে দূতাবাসের সামনে থেকে

এদের অপসারণ করা হয়।

আশা করি আজ সন্ধ্যার আগেই এদের অপসারণ করা হবে।

এফ বি পটাখা

১৭ আগস্ট ১৯৪৩

ইংরেজি দৈনিক *স্টেটসম্যানের* প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কলকাতায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। কিছুদিন যাবৎ এই পত্রিকা দুর্ভিক্ষে মৃত মানুষের ছবিও ছেপে চলেছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত প্রমাণের অভাবে বলা মুশকিল, এসব ছবি আসল, নাকি ভুয়া। দেখলে মনে হয়, ছবিগুলো রিকেট রোগে আক্রান্ত মানুষজনেরই। কিন্তু বিদেশি সব দূতই এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

এফ বি পটাখা

কলকাতা

২০ আগস্ট ১৯৪৩

অবশেষে সদাশয় সরকার রিকেট রোগে আক্রান্ত মানুষগুলোকে হাসপাতালে ভর্তির অনুমতি দিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, একমাত্র কলকাতা শহরেই দৈনিক দুশোর বেশি লোক এই রোগে মারা যাচ্ছে।

এই রোগ এখন মহামারির রূপ ধারণ করেছে। কুইনাইনে উপকার না হওয়ায় ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন। ডায়োফরেটিক মিক্সচার, ক্যাস্টর অয়েল এবং অ্যাসপিরিন তো কোন ছার, কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না।

কয়েকজন রোগীর রক্ত পরীক্ষার জন্য ইউরোপে পাঠানো হচ্ছে। কয়েকজন বিদেশি বিশেষজ্ঞকে এ দেশে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি রয়েল কমিশনও গঠন করা হবে। এই কমিশন টানা চার কি পাঁচ বছর অনুপুঙ্খ তদন্তের পর একটি রিপোর্ট দাখিল করবে।

মোট কথা, এই হতভাগ্যদের বাঁচানোর লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে সব চেষ্টাই চালানো হচ্ছে। মানুষ এর বেশি আর কী করতে পারে! বাইবেলে আছে, জন্ম আর মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে।

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রগুলো বারবার লিখছে যে সারা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ চলছে এবং সপ্তাহে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমার বাড়ির ঝিয়ের (সে তো বাঙালি) বক্তব্য, এসব পত্রিকা মিথ্যা রটনা করছে। বাজারে গেলে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্যই পাওয়া যায়। মদের দাম অবশ্য বেড়েছে; কিন্তু যুদ্ধের সময় এ তো অনিবার্য।

এফ বি পটাখা

২৫ আগস্ট ১৯৪৩

রাজনৈতিক দলগুলো দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ে উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা হাজির করছে। বঙ্গীয় আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানকার মন্ত্রীরাই ঘোষণা করেছে যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করা যায় না। এর মানে, বাংলায় এখন খাদ্যশস্যের রেশনিং প্রথা চালুর কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানকার বিদেশি কূটনীতিকমহল এ সংবাদে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে; কারণ বাংলাকে যদি দুর্ভিক্ষ অঞ্চল ঘোষণা করা হয়, তাহলে খাদ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। তাহলে

তাদেরই অসুবিধায় পড়তে হবে। সোজা কথা, রেশনিং প্রথা চালু হলে তাদের ওপর এর কম প্রতিক্রিয়া হবে না। ফরাসি রাষ্ট্রদূত মি. জাঁগল গতকাল আমাকে বলেছেন, আসন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রণের বিপদে পড়ার আগে আমি যেন মদ মজুদ করে রাখি। আমি চন্দননগর থেকে মদ আমদানি করব বলে ঠিক করেছি। কারণ, ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে নাকি বহু বছরের পুরাতন মদও পাওয়া যায়। এমনকি ফরাসি বিপ্লবের সময়কার পুরাতন মদও নাকি মেলে। হুজুরের সম্মতি পেলে নমুনাস্বরূপ কয়েক বোতল পাঠাতে পারি।

এফ বি পটাখা

২৮ আগস্ট ১৯৪৩

গতকাল এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। আমার ছোট বোন মারিয়ার জন্য নিউ মার্কেট থেকে কয়েকটি পুতুল কিনেছি। তার ভেতর থেকে একটি চীনা পুতুল মারিয়ার খুব পছন্দ হয়েছে। ছয় টাকা দিয়ে পুতুলটি কিনে মারিয়ার হাতে তুলে দিয়ে যখন মোটরের দিকে যাচ্ছি, তখন একটি মাঝবয়সী বাঙালি মেয়েলোক পেছন থেকে আমার কোটের একটা প্রান্ত চেপে ধরে দেহাতি ভাষায় কী যেন বলল। তার নোংরা হাত থেকে কোটটা ছাড়িয়ে নিয়ে মোটরে উঠে বাঙালি চাপরাসিকে বললাম মেয়েলোকটি কী চায়, সে কথা জিজ্ঞেস করতে।

চাপরাসি তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলল। কথার উত্তর দেওয়ার সময় তার কোলের মেয়ে শিশুটিকে আঙুলের ইশারায় দেখাচ্ছিল। রুগ্‌ণ শিশুটির চীনা পুতুলের মতো কালো ডাগর ডাগর চোখ। মারিয়ার দিকে সে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল। তারপর বাঙালি

মেয়েলোকটি খুব দ্রুত কী যেন বলতেই চাপরাসিও দ্রুত তার উত্তর দিতে থাকে।

'মেয়েলোকটি কী চায়,' চাপরাসিকে জিজ্ঞেস করলাম। চাপরাসি মেয়েলোকটির হাতে কয়েকটি পয়সা তুলে দিয়েই গাড়ি ছেড়ে দিল। 'সে তার মেয়েটিকে বিক্রি করতে চায় মাত্র দেড় টাকায়।'

আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাত্র দেড় টাকায়! ও টাকা দিয়ে তো একটা চীনা পুতুলও কেনা যায় না।'

'ইদানীং ওর চেয়ে কম দামে বাঙালি শিশু কিনতে পাওয়া যায়।'

বিস্ময়ে আমার হতবাক হওয়ার পালা। তখন আমার মনে পড়ল সেই পুরোনো ইতিহাসের কথা, যখন আমেরিকার দাস-বাজারে কেনাবেচা করার জন্য আফ্রিকা থেকে নিগ্রো আমদানি করা হতো। সে সময় একটা সাধারণ নিগ্রোকে পঁচিশ ডলারের নিচে পাওয়া যেত না। আমেরিকানরা কী ভুলই না করেছে! আফ্রিকায় না গিয়ে তারা যদি ভারতে চলে আসত, তাহলে অনেক সস্তায় ক্রীতদাস পেতে পারত। নিগ্রোর বদলে ভারতীয় লোকজনকে নিয়ে বেচাকেনা করলে লক্ষ লক্ষ ডলার বাঁচানো যেত। ভারতে একটি মেয়ের মূল্য মাত্র আধা ডলার। ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটি। তাহলে আমেরিকানরা ২০ কোটি ডলারে সমগ্র ভারতবাসীকে কিনে ফেলত পারত। একবার ভেবে দেখুন, আমাদের দেশে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেও আমরা এর চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকি। হুজুরের মেজো মেয়ের কাছে এই চীনা পুতুল পছন্দ না হলে এক ডজন বাঙালি শিশু বিমানে পার্শেল করে পাঠাতে পারি।

চাপরাসি আমাকে বলল, কলকাতার সোনাগাছি পতিতালয়ে

রীতিমতো মানুষ বেচাকেনা করা হয়ে থাকে। এখানে প্রতিদিন বেচাকেনা করা হয় শত শত মেয়ে। মা-বাবারা তাদের মেয়ে বিক্রি করে আর পতিতারা কিনে নেয়। কিনে নেয় মাত্র এক টাকা চার আনা বাঁধা দরে। আর মেয়ে সুন্দরী হলে চার-পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত দাম পেতে পারে। চাল মণপ্রতি ষাট থেকে সত্তর টাকা। সুতরাং কোনো পরিবার দুটি মেয়েকে বিক্রি করতে পারলে আট দশ-দিনের জন্য তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। আর প্রতি বাঙালি পরিবারে গড়ে দু'টার বেশি মেয়ে।

আগামীকাল কলকাতার মেয়র আমাদের এক ভোজসভায় দাওয়াত দিয়েছেন। ওখানে গেলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়ার আশা রাখি।

এফ বি পটাখা

২৯ আগস্ট ১৯৪৩

কলকাতার মেয়রের ধারণা, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং অবস্থা ক্রমশ মারাত্মক হয়ে উঠছে। আমাদের সরকারের তরফ থেকে সাহায্য পাঠানোর জন্য তিনি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছি। অবশ্য তাঁকে সুস্পষ্টভাবে এ-ও জানিয়ে দিয়েছি যে দুর্ভিক্ষ ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং আমাদের সরকার অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। আমরা নির্ভেজাল গণতন্ত্রের পূজারি। সুতরাং ভারতবাসীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

মরা বা বাঁচার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এটা তাদের ব্যক্তিগত, বড়জোর জাতীয় সমস্যা। আন্তর্জাতিক সমস্যা

হতে পারে না। মি. জ্যান জ্যান ট্রিপ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঝোঁকের মাথায় প্রশ্ন করে বসেন, 'যখন আপনাদের আইনসভা বাংলাদেশকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করেনি, তখন আপনারা বিদেশের কাছ থেকে সাহায্য চান কীভাবে?'

এক কথায় মেয়র চুপ, তারপর তিনি 'রসগোল্লা' খেতে শুরু করেন।

এফ বি পটাখা

৩০ আগস্ট ১৯৪৩

হাউস অব কমন্সে দেওয়া ভাষণে ব্রিটেনের ভারতসচিব মি. আমেরি ঘোষণা করেছেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা দেড় গুণ বাড়লেও জমিতে ফসলের উৎপাদনগত পরিমাণ বেড়েছে খুব অল্পই। ভারতবাসী আসলেই পেটুক।

হুজুর, এটা অবশ্য আমারও বক্তব্য।

এসব ভারতবাসী দিনে দুবার বা কখনো একবার মাত্র খেলেও তার পরিমাণ আমাদের পাশ্চাত্য দেশের পাঁচ গুণ বেশি। মি. জ্যান জ্যান ট্রিপের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলায় মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ তাদের অতিভোজন। তারা এতই পেটুক যে অনেক সময় অতিরিক্ত ভোজনের দরুন তারা পাকস্থলী ফেটে মারা যায়। পাকস্থলী না ফাটলে প্লীহা ফেটে তো মরেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে মানুষ ও ইঁদুরের জন্মহার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। অনেক ক্ষেত্রে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। যেমন তাড়াতাড়ি জন্মে, তেমনি মারাও যায় দ্রুত। ইঁদুর যদি মরে প্লেগে, ভারতবাসী মরে

হাড় জিরজিরে রোগে। ইঁদুর প্লেগে মরে; কিন্তু ভারতীয় লোকজন উভয় রোগেই মারা যায়।

যা-হোক, যতক্ষণ ইঁদুর গর্তে থাকে, বাইরে এসে জাগতিক শান্তিতে ব্যাঘাত না ঘটায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।

বাংলাদেশে যে সত্যি সত্যি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং তা যে বাঙালিদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য হয়নি, সেটা তিনি বুঝবেন বলে বাঙালিরা আশা করে। এই দুর্ভিক্ষে ক্রমবর্ধমান ভয়ংকর মৃত্যু-হারের পেছনে যে খাদ্যঘাটতিই প্রধান কারণ, মাননীয় খাদ্যসচিব সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখলে তার চোখে সবই ধরা পড়বে।

এফ বি পটাখা

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩

মাননীয় খাদ্যসচিব দিল্লি ফিরে গেছেন। আশা করা যায় যে ভাইসরয় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে তিনি নিজের বক্তব্য পেশ করবেন।

এফ বি পটাখা

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩

লন্ডনের সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে তো বটেই, অলিগলিতেও প্রতিদিন মানুষ মরছে। কিন্তু এসবই পত্রিকার খবর মাত্র। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন হলেও এ ব্যাপারে

সরকারি কোনো সমর্থন নেই। গতকাল রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছিলেন, তিনি বাংলার দুস্থদের জন্য চীনে একটি রিলিফ ফান্ড খুলতে চান। কিন্তু মনস্থির করে উঠতে পারছেন না। কেননা, কেউ বলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ, আবার কারও কারও মত, দুর্ভিক্ষ বলতে কিছু নেই। আমি তাঁকে বলেছি, বোকামি করবেন না। এই খাদ্যশস্যের ঘাটতির মূলে ভারতবাসীর বেশি খাওয়ার অভ্যাস। রিলিফ ফান্ড খুলে তাদের পেটুকেপনা বাড়াবেন না। এটা দারুণ বোকামি হবে। কিন্তু আমার প্রস্তাব চীনা রাষ্ট্রদূতের মনঃপূত হয়েছে বলে মনে হলো না।

এফ বি পটাখা

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩

চলমান খাদ্যসংকট নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লিতে একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছে। আজও এখানে কয়েক শ লোক মারা গেছে। এ সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, প্রাদেশিক সরকারগুলো, বিশেষত বাংলা সরকার খাদ্য বিতরণ পরিকল্পনার অধীনে কয়েক লক্ষ টাকা আয় করেছে।

এফ বি পটাখা

২০ অক্টোবর

গতকাল গ্রান্ড হোটেলে 'বাংলা দিবস' পালিত হয়েছে। ইউরোপীয় সম্প্রদায় ছাড়া উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, দেশীয় রাজ্যের শাসকবর্গ এতে যোগ দেন। ককটেল বারে মদ ছিল প্রচুর। মাদাম জুলিয়েট ট্রিপের সাথে আমি দুবার নাচে অংশ নিই। বারবার

তিনি চাঁদের অপরূপ সৌন্দর্য ও রাতের অন্ধকারের কথা বলছিলেন। তাঁর মুখ থেকে রসুনের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা নাচার সময় তাঁর মুখে ফিনাইল ছিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। তিনি বলেছেন, রিলিফের জন্য প্রায় নয় লাখ টাকা চাঁদা উঠেছে। মাদাম ট্রিপ অপূর্ব সুন্দরী। যেহেতু তাঁর ভারতীয় বন্ধুর সংখ্যা বেশি, তাই কূটনীতিকমহলে তাঁর দারুণ কদর। মাদাম জুলিয়েট মি. জ্যান জ্যান ট্রিপের স্ত্রী হওয়ায় আন্তর্জাতিক ব্যাপার-স্যাপারেও তার বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। উপস্থিত ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে মিস সিন্‌হা নামে এক অপরূপ সুন্দর মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নেচেওছিলেন চমৎকার।

এফ বি পটাখা

২৬ অক্টোবর ১৯৪৩

বোম্বাইয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী মি. মুন্সির হিসাব অনুযায়ী বাংলায় প্রতি হপ্তায় প্রায় এক লাখ লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু এটা সরকারি হিসাব নয়।

আজও দূতাবাসের সামনে মৃত লাশ পাওয়া গেছে। আমার চাপরাসি বলল, এদের সবাই একই পরিবারের সদস্য। সবাই গ্রামাঞ্চল থেকে খাবারের সন্ধানে কলকাতা এসেছিল।

গতকাল একজন সংগীতশিল্পীর লাশ দেখেছি। এক হাতে তিনি একটি সেতার আঁকড়ে ধরে আছেন, অন্য হাতে শিশুদের খেলার একটা কাঠের ঝুমঝুমি। একটা বাদ্যযন্ত্র এবং একটা খেলনা। আমি এর কোনো অর্থ খুঁজে পাইনি।

হতভাগ্য ইঁদুরের দল! কেমন নিঃশব্দে মরে, মুখে সামান্য 'আহ্' শব্দ করারও জোর নেই।

বিশ্বে ভারতবাসীর মতো এমন নিরীহ শান্ত গোবেচারী ইঁদুরের পাল আমার চোখে পড়েনি। শান্তির জন্য যদি কেউ নোবেল প্রাইজ পায়, তাহলে অবশ্যই তা ভারতবাসীর প্রাপ্য। বিনা প্রতিবাদে এরা উপবাস করছে আর লাখে লাখে মরছে। প্রাণহীন দৃষ্টিহীন চোখে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন বলছে, 'হে ভগবান, আমাদের অন্ন দাও, অন্ন দাও।'

গত রাতে হতভাগ্য সংগীতশিল্পীর একজোড়া চোখ বারবার আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

এফ বি পটাখা

৫ নভেম্বর ১৯৪৩

নতুন লাট বাহাদুর (ভাইসরয়) এসেছেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে ত্রাণকাজে অংশ নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। যারা পথেঘাটে মরছে, তাদের জন্য শহরতলিতে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ক্যাম্পে তাদের সব ধরনের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হবে।

এফ বি পটাখা

১০ নভেম্বর ১৯৪৩

মি. জ্যান জ্যান ট্রিপের ধারণা, বাংলায় দুর্ভিক্ষের বিষয়টি সত্য হতে পারে। হাড় জিরজিরে শুকনো রোগের মহামারির কথা বোধ হয় সত্য নয়। বিদেশি দূতাবাসগুলোয় তার এই বক্তব্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আরবানিয়া, প্রিটানিয়া এবং টিরানিকার দূতেরা মনে করেন, মি. জ্যান জ্যান ট্রিপের উক্তিতে আছে আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত।

ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে ভারতে আসা আশ্রয়প্রার্থীরা বড়লাটের এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। তারা ভাবছে, বাংলাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল ঘোষণা করলে তাদের ভাতার কী বন্দোবস্ত হবে? তারা যাবেই-বা কোথায়? বড়লাটের বিবৃতির ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভারতে ইউরোপীয় আশ্রয়প্রার্থীদের স্বার্থের জন্য কি আমদের সংগ্রাম করা উচিত? পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, তমদ্দুন ও সভ্যতার দাবিগুলো কী? স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমাদের কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে? এ বিষয়ে হুজুরের আদেশের প্রতীক্ষায় আছি।

এফ বি পটাখা

২৫ নভেম্বর ১৯৪৩

মি. জ্যান জ্যান ট্রিপের ধারণা, বাংলায় সত্যিই কোনো দুর্ভিক্ষ নেই। অবশ্য চীনা রাষ্ট্রদূত মি. নান নান নিংয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলায় দুর্ভিক্ষ আছে। যে উদ্দেশ্যে কলকাতার দূতাবাসে আমাকে পাঠানো হয়েছিল, গত তিন মাসে আমি তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। এজন্য আমি দুঃখিত। বাংলায় দুর্ভিক্ষ আছে কি না, এ বিষয়ে আমি একটিও প্রামাণ্য সমর্থন পাইনি। তিন মাস আপ্রাণ অনুসন্ধানের পরও আমি এ প্রশ্নের কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে পাইনি। এজন্য আমি লজ্জিত এবং হুজুরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি আপনাকে সবিনয়ে অবগত করছি যে, আমি হুজুরের মেজো মেয়ে এডিথের প্রেমে পড়েছি এবং তিনিও আমার প্রেমে পড়েছেন। এমতাবস্থায় কলকাতা দূতাবাস থেকে বদলি করে

আমাকে অন্য কোথাও রাষ্ট্রদূত জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া এবং আপনার মেজো মেয়ে এডিথের সঙ্গে বিয়ের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে হুজুরের আজ্ঞা হয়। এই দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য হুজুরের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

এই চিঠির সঙ্গে এডিথের জন্য একটি নীলকান্ত মণির আংটি পাঠানোর ধৃষ্টতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এই প্রাচীন ভারতীয় আংটি একদা সম্রাট অশোকের কন্যা ব্যবহার করতেন।

আপনার একান্ত অনুগত সেবক
স্বাক্ষর—এফ বি পটাখা
কলকাতায় সাইলোরিকার রাষ্ট্রদূত

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে লোকটি মারা গেছে

সকালে নাশতার টেবিলে খবরের কাগজ খুলতেই তার চোখে পড়ল বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত দুস্থদের ছবি। তারা মরছে সর্বত্র—গাছতলায়, অলিগলিতে, হাটবাজারে, খেতখামারে। ওরা মরছে হাজারে হাজারে।

ডিমের অমলেট খেতে খেতে সে ভাবল, কীভাবে এই দুর্গতদের সাহায্য করা যায়! সত্যিই এরা হতভাগা। নৈরাশ্যের চরমে পৌঁছেছে তাদের দশা। তাদেরকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে কঠোর বাস্তবের সামনে দাঁড় করালে সেটা সত্যিই ভয়ানক নিষ্ঠুর ধরনের কিছু হবে, অমানুষিক কাজ হবে।

সে খবরের কাগজের পাতাগুলো তাড়াতাড়ি উল্টে যায়। টোস্টের ওপর জেলি ছড়িয়ে দেয়। মচমচে তাজা টোস্টের স্বাদকে সতেজ করে তুলল টকঝাল জেলি—প্রসাধনী যেমন নারীকে লাবণ্যময় করে তোলে। হঠাৎ মিস সিন্‌হার কথা তার মনে পড়ল। সে এখনো এসে পৌঁছায়নি, কথা ছিল তার সঙ্গে সে চা-পর্ব সারবে। বেচারি এখনো হয়তো ঘুমিয়ে আছে। কটা বাজে?

ঘড়ি দেখে। সোনার ঘড়ি। কালো সিল্কের চেইনটা তার মসৃণ ফরসা হাতের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে। মানিয়েছে সুন্দর। সে

মনে মনে ভাবল—একটা ঘড়ি, বোতাম আর টাইপিন—এই হলো পুরুষের অলংকার। আর মেয়েদের? গয়নার পর গয়নায় তারা আপাদমস্তক মুড়িয়ে রাখে। কানে গয়না, কপালে গয়না, কোমরে গয়না, নাকে, মাথায়, গলায়, হাতে সর্বত্র গয়নার ছড়াছড়ি। কিন্তু পুরুষের বেলায় মাত্র তিনটে। অবশ্য ইদানীং টাইপিন চালু নেই বলে আজকাল সেটা এসে দাঁড়িয়েছে দুটোয়।

উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে করতে সে পরিজ খেতে শুরু করে। পরিজ থেকে এলাচের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ তার নাকে এসে লাগে সেন্টের প্রায় আবেশ ধরানো মধুর গন্ধ, যে গন্ধ সে মিস সিন্‌হার সঙ্গে নাচার সময় পেয়েছিল তাঁর শাড়ি আর চুল থেকে।

গ্রান্ড হোটেলে তার নাচের অনুষ্ঠান। গত রাতে নৃত্যের যে মায়াজাল সে বুনেছিল, এখনো যেন তার রেশ চলছে। মিস সিন্‌হার মতো নাচের জুটি মেলা ভার। তারা দুজন যখন নাচছিল, তখন উপস্থিত সবার দৃষ্টি আটকে ছিল তাদের দিকে। সিন্‌হার কানে সোনার দুল। তাতে তার পুরোটা কান ঢাকা পড়েছে। ঠোঁটে তার হাসি, যৌবনোচ্ছল দেহের বাঁকে বাঁকে তাঁর ইন্দ্রজালের ছায়া, স্তনরেখা বরাবর ঝলমলে মুক্তোর হার। তার থেকে আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। ঘুরছে, পাক খাচ্ছে। অস্থির সাপের মতো দোমড়াচ্ছে আবার শান্ত হয়ে পড়ছে। সে অপূর্ব রুম্‌বা নাচ নাচল। তার দেহের ছন্দোময় ভঙ্গি, তার জর্জেট শাড়ির আবর্তন জ্যোৎস্না রাতে সাগরের তরঙ্গরাশির রুপোলি তটের বুকে আছড়ে পড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঢেউ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, তীর স্পর্শ করছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। নাচের বাজনা থেকে থেকে দ্রুতলয়ের হয়ে ওঠে, আবার অনুচ্চ গ্রামে নেমে আসে। ধীরে, খুবই ধীরে জ্যোৎস্না-ধোয়া তরঙ্গরাশি সমুদ্রতটে চুমু খেয়ে আবার

ফিরে যাচ্ছে। মিস সিন্‌হার ঠোঁট দুটো অর্ধেক খোলা। তার দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা। ঠিক এ সময় হঠাৎ করেই আলো নিভে গেল। ঠোঁটে ঠোঁট, দেহে দেহ মিলিয়ে নিমীলিত চোখে মিস সিন্‌হা আর সে বাজনার তালে তালে নেচে চলেছে। সেই ঢেউয়ের শিথিল জোয়ার-ভাটা, সেই মধুর মনমাতানো ঝড় নাচাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক...। শুধু একটি চুম্বন আর একটি গানের সুর ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

প্লেটে টুকরো টুকরো করে কাটা আপেল। চামচ দিয়ে আলতো করে একটা টুকরো তুলে নিল। একটা কাপে ঢালল আবারও চা। আর ভাবতে লাগল, কী নিখুঁত মিস সিন্‌হার দেহবল্লরী। কী সুন্দর তার মন! একেবারে সাদাসিধে। খুব চালাকচতুর মেয়ে তার পছন্দ নয়। তারা সব সময় তর্ক জুড়ে দেয়। সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, মার্ক্সবাদ, স্বাধীনতা আর মেয়েদের শিক্ষা ও জীবিকা নিয়ে অনর্গল কথা বলতে পারা হলো একজন আধুনিক মেয়ের প্রকৃত রূপ। মেয়ে নয় যেন দর্শনের মোটা গ্রন্থ। এমন মেয়ে বিয়ে করার চেয়ে অ্যারিস্টটল পড়ে জীবন কাটানো অনেক শ্রেয়।

সে আবার অধৈর্য হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। মিস সিন্‌হা তখনো আসেনি। চার্চিল, স্টালিন আর রুজভেল্ট বৈঠকে মিলিত হয়েছেন, পাল্টে দিচ্ছেন পৃথিবীর মানচিত্র আর এদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে বাংলাদেশে। মানবতা উপহার পাচ্ছে আটলান্টিক সনদ—আর বাংলায় এককণা চালও নেই। ভারতের দুঃখে সে অভিভূত। তার দুচোখ সজল হয়ে ওঠে। সে ভাবল, আমরা দরিদ্র, আমরা অসহায়, দুস্থ, নির্যাতিত। আমাদের বাড়ি সেই কবি মীরের ঘরের মতো, যিনি কেঁদে বলেছিলেন, 'দেয়াল

ধসে পড়ছে আর চাল থেকে ঝরে পড়ছে বেদনার অশ্রু।' তার মনে হলো, এই ভারতবর্ষ চিরকাল কাঁদছে। কখনো তার অন্ন নেই, কখনো বস্ত্র নেই। আবার কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো-বা অতিবৃষ্টি, কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো-বা মহামারির শিকার। আজ তাকিয়ে দেখো বাংলার সন্তান-সন্ততিদের দিকে। অস্থিসার চোখে চিরকালের বিষণ্নতা। আর দুঃখে ভিক্ষুকের আর্তি, ফেন দাও, প্রাণ দাও।

হঠাৎ তার মুখের চা বিষবৎ হয়ে উঠল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, সে এগিয়ে যাবে, দেশের মানুষকে সাহায্য করবে, চাঁদা তুলবে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে, বক্তৃতা দিয়ে দেশবাসীর ঘুমন্ত বিবেক জাগিয়ে তুলবে। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা করবে। গড়ে তুলবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। ফলে, দেখতে দেখতে জমে উঠবে চাঁদার স্তূপ। বিদ্যুতের গতিতে প্রাণস্পন্দন বয়ে যাবে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। হঠাৎ সে যেন দেখতে পেল পত্রিকার পাতায় তার নাম বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে। সব পত্রিকাই তার দেশপ্রেমের গুণগানে মুখর। যে পত্রিকাটি সে পড়ছিল, তাতেই সে দেখতে পেল তার নিজের ছবি। তার পরনে খদ্দরের পোশাক। জওহরলাল নেহরুর মতো জহরকোটও গায়ে। আর মুখে তাঁরই মতো মিষ্টি হাসি।

হ্যাঁ, সবকিছু ঠিক আছে। সে আবার বেয়ারাকে ডাকল। ডেকে আরেকটা অমলেট আনতে বলে।

আজ থেকে সে তার নিজের জীবনের ধারা পাল্টে দেবে। এখন থেকে সে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এসব উপবাসী, মৃত্যুপথযাত্রী দেশবাসীর কল্যাণে ব্যয় করবে। তার জীবন পর্যন্ত এদের জন্য উৎসর্গ করবে। এ রকম ভাবনার এক পর্যায়ে হঠাৎ

করেই সে যেন দেখতে পেল সে একটা কারাগারের ফাঁসির প্রকোষ্ঠে বন্দী। তাকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার গলায় ঝুলছে ফাঁসির রশি। জল্লাদ মাথায় কালো টুপি পরিয়ে দিয়েছে। সে মোটা কাপড়ের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'আমার ভুখানাঙ্গা দেশবাসীর জন্য আমি প্রাণ দিচ্ছি।' কথাগুলো ভাবতেই তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তার চোখ থেকে দুফোঁটা গরম লোনা জল চায়ের কাপে ঝরে পড়ল। রুমাল ঘষে মুছে ফেলল সেই চোখের জল।

এমন সময় একটা মোটরগাড়ি বারান্দায় এসে থামল। সে মিস সিন্‌হাকে দেখতে পেল। মোটরের দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে সে ঘরে এসে ঢুকল হাসিমুখে।

'হ্যালো' বলে মিস সিন্‌হা তাকে ডাকল। কাছে যেতেই দুহাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে নিজের সুবাসিত ঠোঁট ছোঁয়াল তার গালে। আলো, উষ্ণতা, আনন্দ—সবকিছু মেশানো তার হাসির সঙ্গে। তাতে অবশ্য বিষও মেশানো আছে। বিষ আছে তার ঠোঁটে, চোখে, পিঠের বাঁকে, তার কোমরের বাঁকে, তার কালো চুলের বিন্যাসে, বিষ আছে তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপে। সে যেন অজন্তার এক নিখুঁত ভাস্কর্য, যার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিল্পীর বিষাক্ত তুলিতে আঁকা।

'নাশতা খাবে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'না, ধন্যবাদ। খেয়েছি এসেছি।' হঠাৎ করে তার সজল চোখ দেখে মিস সিন্‌হা জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে, তোমাকে উদাস উদাস লাগছে কেন?'

'কিছু না, তেমন কিছু না। এইমাত্র বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কথা পত্রিকায় পড়েছি তো।' সে বলে, 'মিস সিন্‌হা, বাংলার দুর্গতদের জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।'

'হায় রে কপাল, ডার্লিং,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিস সিন্‌হা। তারপর পকেট-আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে লিপস্টিকটা ঘষে নিয়ে বলল, 'ভগবানের কাছে ওদের বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আমরা আর কীই-বা করতে পারি!'

'একেবারে ঠিক কথা বলেছ!' উত্তেজনায় সে চেঁচিয়ে ওঠে।

'প্রত্যেক মন্দিরে-মসজিদে মৃত্যুর মুখোমুখি উপবাসী বাংলার মানুষের জন্য প্রার্থনা করা হোক।'

'চমৎকার প্রস্তাব! মিস সিন্‌হা, তুমি সত্যিই অনন্যা।'

'হাজার হলেও কনভেন্টে পড়াশোনা করা মেয়ে আমি,' মিস সিন্‌হা তার ধবধবে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলে।

কথাটা শোনার পর সে একটুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, 'কিন্তু আমাদের একটা প্রস্তাবও পাস করতে হবে।'

'কেন,' শাড়ির প্রান্ত ঠিক করতে করতে মিস সিন্‌হা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

'প্রস্তাবটা কেন, আমি ঠিক বলতে পারব না,' তার উত্তর। 'কিন্তু আমি জানি দেশে যখনই কোনো বিপদ ঘটে, তখন কোনো না কোনো প্রস্তাব পাস করাতেই হয়। শুনেছি, প্রস্তাব পাস করালেই নাকি সব বিপদ কেটে যায়। আচ্ছা, এ ব্যাপারে বরং কোনো নেতাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করি। জিজ্ঞেস করলে ভালো হবে।'

'ভুলে যাও ডার্লিং, ওসব ভুলে যাও,' বাঁকা হাসি হাসে মিস সিন্‌হা, 'আমার খোঁপায় ফুলটা কেমন মানিয়েছে, বলো তো?'

খোঁপায় গোঁজা নীল রাজফুলের বোঁটায় মৃদু আঘাত করে সে বলল, 'চমৎকার ফুল! নীল কৃষ্ণের গায়ের মতো। যেন গোখরার ফণা। বিষের মতো রং।' তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে, 'না না, যেভাবে হোক একটা প্রস্তাব পাস করাতেই হবে। কাউকে ফোন করি।'

হাত দিয়ে মিস সিন্‌হা তাকে বাধা দিল। তার আঙুলের মৃদু স্পর্শে তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ আর স্নায়ু জুড়ে যেন খেলে গেল মসৃণ শিরশিরে একটা অনুভূতি। আবেগের ভঙ্গুর ঢেউ যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

'কালকের শেষ পর্বের রুম্‌বা নাচটা অপূর্ব হয়েছিল, তাই না!' তার গালে আলতো চুমু খেয়ে কথাটা মনে করিয়ে দিল মিস সিন্‌হা।

পিঁপড়ের দল যেন তার অনুভূতিতে আবার পাক খেতে শুরু করে। হাজার হাজার দুস্থ-দুর্গত মানুষ তার মনে ভিড় করতে থাকে। সে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'আমাকে বলো মিস সিন্‌হা, প্রস্তাব পাস করার পর আমরা কী করব? আমার মনে হয় দুর্গত অঞ্চল দেখে আসা উচিত। তোমার কী মত?'

'ব্যাপারটার ওপর তুমি এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন, বলো তো?' অনেকক্ষণ ভেবে ভীতি-মেশানো গলায় মিস সিন্‌হা বলে। 'এসব করতে গেলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। যত কিছুই করো না কেন তুমি, হতভাগারা মরবেই। ওদের শান্তিতে মরতে দাও। এ নিয়ে তুমি এত অস্থির হয়ে উঠেছ কেন?'

'দুর্গত অঞ্চলে আমাকে যেতেই হবে। মিস সিন্‌হা, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'বাংলার গ্রামে গ্রামে।'

'অবশ্যই যাব। কিন্তু থাকব কোথায়? ওখানে কোনো ভালো হোটেল আছে?'

হোটেলের কথা শুনে তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হলো। ব্যাপারটাকে বুকে চাপা দিয়ে রাখল, যেখানে তার অনেক অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা কবর দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বেজার হয়ে সে অভিমানী শিশুর মতো মুখ ভার করে বসে থাকে। মিস সিন্‌হা নীরবতা ভেঙে বলে, 'এখন বলছি, আমাদের কী করা উচিত। চলো, গ্রান্ড হোটেলে জাঁকজমকপূর্ণ বলড্যান্সের আয়োজন করি। প্রবেশমূল্য মাথাপিছু দু'শ টাকা, মদের দাম আলাদা, যা আয় হবে দুর্গতদের রিলিফ ফান্ডে জমা দিয়ে দেব।'

একলাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় সে, আবেগে মিস সিন্‌হাকে জড়িয়ে ধরে।

'এই জন্যই কি নাচের শেষে কাল রাতে বিয়ের কথাটা তুলেছিলে তুমি,' মিস সিন্‌হা হেসে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কী উত্তর দিয়েছিলে,' সে-ও পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

'আমি প্রস্তাব নাকচ করেছিলাম,' মিস সিন্‌হা লজ্জা-মেশানো স্বরে স্বীকার করে।

'খুব ভালো করেছ। মদ একটু বেশি খেয়েছিলাম, তাই,' সে উত্তর দিল।

তাদের মোটর মিউনিরাম, জেভনিরাম, আর ভেন্ডোমল সিগারেটের দোকানগুলো ঘুরে অবশেষে গ্রান্ড হোটেলের সামনে এসে থামে। হোটেলটা বিরাট জমকালো একটা মোগল স্মৃতিসৌধের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ছেঁড়া ময়লা ধুতি পরা একটা বাঙালি ছেলে রাস্তায় ভিক্ষে করছে। সে তাদের গাড়ির কাছে এসে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে, 'দুদিন কিছুই খাইনি, কিছু খেতে দাও।' তার সঙ্গে কদাকার ধুলোমলিন একজন কিশোরী। বিরক্তিভরে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মিস সিন্‌হা।

'মেম সাব, একটা পয়সা দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে,' ছেলেটা করুণ স্বরে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে।

'তোমার জন্য কী সিগারেট আনব,' সে জানতে চায়।

'টার্কিশ,' উত্তর দিল মিস সিন্‌হা।

দোকানে ঢুকল সে। গাড়িতে বসে থাকে মিস সিন্‌হা।

বাংলার ক্ষুধার্ত মৌমাছির দল যেন গুনগুন করে ফিরছে মাথার ভেতরে 'মেম সাব', 'মেম সাব' বলতে বলতে। সে তাদের ধমক দেয়। একবার, দুবার। কিন্তু ক্ষুধা তো ধমকের তোয়াক্কা করে না। বাচ্চা কচি মেয়েটা ভীরু পায়ে এগিয়ে এসে তার শাড়ির আঁচল ধরে করুণ সুরে কেবলই বলতে থাকে, 'মেম সাব, মেম সাব...মেম সাব।' রেগে সে ভিখিরি মেয়েটার হাত থেকে তার শাড়ির আঁচল ছিনিয়ে নেয়।

সে ফিরে এলে মিস সিন্‌হা বলতে থাকে, 'ভিখিরিগুলো কী জঘন্য! তুমি যতক্ষণ ছিলে না, আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে মেরেছে! সিটি করপোরেশন কি এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না! তুমি যখন দোকানে ঢুকলে, এই ভিখারি ছেলেটা...।'

সে এবার এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার গাল বরাবর ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়, চুলের মুঠি ধরে মেয়েটাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয়। তারপর গাড়ির স্টার্টারে পা দিতেই কারটা গ্রান্ড হোটেলের গাড়ি রাখার জায়গায় গিয়ে হাজির হয়।

ধুলোময় রাস্তার ওপর পড়ে মেয়েটা কাঁদতে শুরু করে আর ছেলেটা এগিয়ে যায় বোনের কাছে। তাকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কোথাও লাগেনি তো?' অসহায়ের মতো মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

নাচ তখন চরমে উঠেছে।

মিস সিন্‌হা তার পা দুটোকে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য বসে ছিল।

'কত টাকা তুলেছি আমরা,' জিজ্ঞেস করে মিস সিন্‌হা।

'মাত্র সাড়ে ছয় হাজার। মাত্রই তো সন্ধ্যা। রাত চারটার মধ্যে...। মনে হয় ন-হাজার টাকার মতো তুলতে পারব,' সে বলল।

'তুমি দারুণ খেটেছ,' মিস সিন্‌হার হাতে নিজের হাতের চাপ দিয়ে সে বলে।

'তুমি কী নেবে?'

'একটা জিন আর সোডা।'

মিস সিন্‌হা অর্ডার দেয়, 'বেয়ারা, সাহেবের জন্য সোডা আর একটা বড় জিনের বোতল নিয়ে এসো।'

'তোমার জন্য কী আনবে?'

'মদ গেলা আর নাচ, নাচ আর মদ—ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,' সে বলে, 'দেশের জন্য তো কষ্ট করতে হয় ডার্লিং।' মিস সিন্‌হাকে আশ্বাসভরা গলায় সে বলে।

'সত্যি জানো, সাম্রাজ্যবাদকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি।'

আন্তরিকতার সুরে মিস সিন্‌হা বলে, 'বেয়ারা, আমার জন্য একটা ভার্জিন আনো।'

বেয়ারা টেবিলে মদের বোতল রেখে যায়।

বোতলটা ঝাঁকাতেই মদ ভোরের আলোর মতো গোলাপি হয়ে উঠল। আলোর সামনে বোতল ওপরে তুলে ধরতেই ঝলমল করে ওঠে পদ্মের মতো। তার হাতে ধরা গ্লাসের মদ কাঁপতে থাকে। সেই মদ ধারণ করে রক্তের মতো লাল রং। আবার নাচতে শুরু করে সে আর মিস সিন্‌হা। এক সুর এক লয় আর এক তালে। সবকিছু হারিয়ে গেল নাচ আর সুরের সাগরে। সীমাহীন আকাশজুড়ে দুজন যেন রীতিমতো ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কাঁধের ওপর মিস সিন্‌হার গালের স্পর্শ আর চুলের মোহনীয় গন্ধ যেন তাকে নীরবে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে।

সত্যিই অপূর্ব তার চুলের খোঁপা। বিচিত্র তার গড়ন! যেসব মেয়ে বাঁধাধরা ফ্যাশনে অভ্যস্ত, মিস সিন্‌হা তাদের তুলনায় পুরোপুরি ভিন্ন। একজন শিল্পী যেমন তার মনপ্রাণ দিয়ে গড়ে তোলে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, তেমনি মিস সিন্‌হাও ঠিক একইভাবে যথেষ্ট পরিশ্রম করে থাকে চুলের শৈল্পিক বিন্যাসে। একেক দিন তার চুল হয়ে ওঠে ফুটন্ত পদ্মের মতো, তার কানের পাশে কুঞ্চিত হয়ে থাকা কেশগুচ্ছ তখন যেন হয়ে ওঠে ঠিক গোখরোর ফণা। মাঝেমধ্যে সে সাজগোজ করতে গিয়ে শাহজাদি হয়ে ওঠে। পরের দিনই আবার হয়ে ওঠে সেই চুল হিমালয় পর্বতের চড়াই-উতরাইয়ের মতো। আসলে চুলের খোঁপা বাঁধায় মিস সিন্‌হার স্বকীয়তা এতই বেশি যে, মাঝেমধ্যে মনে হয় তার মগজে কোনো বুদ্ধি নেই, আছে কেবল তার ওই চুলে...।

নাচ তখন তুঙ্গে। মিস সিন্‌হার কেশগুচ্ছ এসে লাগছে তার গালে, তার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গজুড়ে তুমুল নাচের ছন্দ। মিস সিন্‌হা ও তার দেহ কামনার আগুনে জ্বলেপুড়ে একাকার হয়ে যায়। নাচের তালে তালে তারা দুজনই হয়ে উঠেছে যেন আগুনের শিখা, সুরের তরঙ্গাঘাতে এখন তারা উন্মাতাল। নিবিড় উষ্ণতার স্নিগ্ধ ঢেউ সাগরের বালুতটে যেন আলতোভাবে চুমো খেয়ে ফিরছে, আলতো সুরে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে চলেছে—ঘুমাও, ঘুমাও। জীবনের পরিণতি মৃত্যু। নড়বে না। ভাবনার অবকাশ নেই। জীবনের মূল লক্ষ্য শান্তি। মুক্তির কথা চিন্তা করে অধীর হোয়ো না। গোলামিই তো জীবনের সব।

নাচের আসর ঘিরে চারদিকে যেন বিষের আমেজ ছড়ানো...মদে বিষ...সংগীতে বিষ...নারীদেহে বিষ। ঘুম আর বিষ আর মিস সিন্‌হার রহস্যময়ী হাসি, তার আধখোলা

অধরযুগল... । বিষ...বিষ নাচের ছন্দে, বাদ্যযন্ত্রের সুরেও বিষ। ঘুমাও, ঘুমাও...ঘুমাও অনন্তকালের জন্য... । হঠাৎ আলো নিভে গেল, মিস সিন্‌হার অধরে তার অধর, তার দেহের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল মিস সিন্‌হার দেহ। ধীরে ধীরে...সে বাজনার তালে তালে এদিক-সেদিক দুলছে। মহাকালের উষ্ণ আলিঙ্গনে যেন সে তলিয়ে গেল সে কোন অতল কোনো গহ্বরে। সে হারিয়ে গেল সুরের মূর্ছনায়। সে যেন ঘুমিয়ে পড়ল আর তার মৃত্যু হলো।

তৃতীয় অধ্যায়

লোকটি এখনো মারা যায়নি

আমি কি মরে গেছি, না বেঁচে আছি ...? আমার প্রাণহীন বিস্ফারিত চোখ দুটো আকাশের অসীম নীলিমায় কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে!

সেবা সমিতি, পুলিশ বা আঞ্জুমানের লোকজন আমার মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়ার আগে একবার এই দূতাবাসের সিঁড়িতে বসো, শোনো আমার কাহিনি। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আমিও তোমাদের মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। আমার দেহে অবশ্য মাংসের চেয়ে হাড়ই চোখে পড়বে বেশি। গ্রন্থিগুলো পচতে শুরু করেছে; নাক দিয়ে বের হচ্ছে পানি, সেই সঙ্গে বিশ্রী গন্ধ। এতটুকু মিথ্যা নেই এতে। এটা তো বিজ্ঞানেরই মামুলি ব্যাপারস্যাপার।

তোমার ও আমার মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে; মগজ হয়ে গেছে নিষ্ক্রিয় আর পেটে এখনো ক্ষুধার তীব্র জ্বালা। আমি মরে গেছি সত্যি; কিন্তু এত ক্ষুধার্ত যে, পেটে এককণা চাল পড়লে আমার মৃতদেহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে। বিশ্বাস না হয় একবার পরখ করে দেখতে পারো। কিন্তু যাচ্ছ কোথায়? মরা মানুষকে ভাত চাইতে দেখে বুঝি ভয় পেয়ে গেলে! কলকাতায় মরা মানুষও ভিক্ষা চায়। আমি একটু মশকরা

করলাম। ভগবানের দোহাই, চলে যেয়ো না। শুনে যাও আমার জীবনকাহিনি, চালের কথা ভেবে ব্যস্ত হোয়ো না। চাল তোমার হাতের মুঠোয় ধরে রাখো। আমার শরীর পচতে শুরু করেছে। তাই তোমার কাছে আমি আর চালের একটা কণাও ভিক্ষা চাইব না। এ শরীরের জন্য আজ আর এককণা ভাতেরও প্রয়োজন নেই। এই দেহই একদিন এককণা চালে পরিণত হবে। এই মাটির দেহ নরম মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাবে। মাটিতে বোনা ধানের বীজ দেখতে দেখতে তার শেকড় ছড়াবে। তারপর একদিন অল্প পানির স্তর ভেদ করে মাথা তুলবে ওপরে, বাতাসে তার সবুজ শিষগুলো মাথা নেড়ে দুলবে। হাসবে, হাসিতে ফেটে পড়বে; রোদের সঙ্গে খেলা করবে; জ্যোৎস্নায় করবে স্নান, কান পেতে শুনবে পাখির কলগান। সেই ধানের শিষে মৃদুমন্দ হাওয়া এসে চুমু দিয়ে যাবে। আর তখন ধানের শিষের অণুতে অণুতে জন্ম নেবে নতুন এক রূপ, নতুন জীবন, নতুন এককণা চাল। হ্যাঁ, ছোট খোসার আবরণে ঢাকা এককণা চাল—স্বচ্ছ, শুভ্র, সুন্দর—শুক্তির ভেতরে যেন একবিন্দু মুক্তা।

আজ একটা গোপন রহস্য বলব তোমাকে, পৃথিবীর মানবজীবনের সবচেয়ে গোপন কথাটি একমাত্র মরা মানুষই বলতে পারে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাকে মানুষ না করে এককণা চালে পরিণত করে। প্রার্থনা করো, সনির্বন্ধ অনুরোধ করো, মিনতি জানাও, অনশন করো, তপস্যা করো তোমাকে মানুষ থেকে এককণা চালে পরিণত করার জন্য। সবকিছু উজাড় করে দিয়ে ভগবানের কাছে আবেদন জানাও। মানুষের মতো চালের কণারও জীবন আছে। কিন্তু তার জীবন অনেক বেশি মহৎ, অনেক নিষ্কলুষ, অনেক পবিত্র, অনেক সুন্দর। শুধু প্রাণটুকু ছাড়া মানুষের আর কীই-বা আছে? মানুষের

সম্পদ তো শুধু তার দেহ নয়, বাড়িঘর ধনদৌলত নয়—সম্পদ হলো তার আত্মা ও প্রাণ। বাকি যা-কিছু, অর্থাৎ দেহ, জমিজমা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি মানুষ ব্যবহার করার পর সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে যায়। কিন্তু তার মনে আঁকা থাকে কয়েকটি ছবি, কয়েকটি স্মৃতির টুকরো, প্রজ্বলিত আগুনের অঙ্গার, এক টুকরো মুচকি হাসি। এসব নিয়েই মানুষ বাঁচে। আর মরার সময় শুধু দেহই সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

চালের কণার জীবনকথা তোমাকে বলেছি। এবার আমার জীবনকথা শোনাব। ঘৃণায় বিরক্ত হোয়ো না। আমার দেহের মৃত্যু হলেও আমার আত্মা মরেনি। চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ার আগে আমার আত্মা সেসব দিনের কাহিনি তোমাকে শোনাতে চায়, যখন আত্মা আর দেহ এক ছিল; একসাথে চলত, কথা বলত, হাসত, নাচত, গান গাইত।

আত্মা আর দেহ—দুয়ের মিলনেই জীবন। এ দুয়ের মিলনেই আছে আনন্দ, প্রেরণা, প্রাণ—সবকিছু। মাটি আর পানি মিলেমিশেই জন্ম দেয় চালের কণা; নর আর নারীর মিলনে জন্ম নেয় এক হাসিখুশি জীবন্ত শিশু। আত্মা আর দেহ যখন এক হয়, তখনই সৃষ্টি হয় জীবন।

এসো বসো, তোমাকে আমি দেহ আর আত্মার কাহিনি শোনাই, শোনাই আজ তাদের কথা, যারা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। দেহ আর মন—পার্থক্য এটুকু, দেহ যখন আত্মা থেকে পৃথক হয়, তখন দুর্গন্ধ বের হয়, আর আত্মা দেহ থেকে পৃথক হলে বের হয় ধোঁয়া। যদি ভালোভাবে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে এই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে কেঁপে কেঁপে জ্বলে ওঠে আমার অতীত দিনের আবছা সব স্মৃতি। বিদ্যুতের ওই ঝলকানি কী, জানো? সে হলো আমার বউয়ের হাসি...। হ্যাঁ, ওই তো আমার

বউ....লজ্জা কী? এগিয়ে এসো, বন্ধু। এবার দেখতে পাচ্ছ এই নিষ্কলুষ সৌন্দর্য, সেই আজানুলম্বিত একরাশ চুল। লাজনম্র হাসি, সেই আনত কোমল একজোড়া চোখ—এই তো সেই মেয়ে, তিন বছর আগে যাকে প্রথম দেখেছিলাম জেলেদের পাড়ায় সমুদ্রতীরে এক পড়ন্ত বিকেলে। তখন এক জমিদার তনয়াকে আমি সেতার শেখাতাম। সমুদ্রতীরের আতাপাড়ায় পিসিকে দুদিনের ছুটিতে দেখতে গিয়েছিলাম। নির্জন সমুদ্রতীরে বাঁশ আর তালগাছের সারিতে ঘেরা এই শান্ত গ্রামখানি তখন ঢাকা পড়েছিল এক বিষণ্ন চাপা নিস্তব্ধতায়।

জানি না, বাংলার গ্রামে এত বিষাদ কেন! এখানকার চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। দূর-বিস্তৃত অতলান্ত সাগর, কূল-কিনারাহীন, সীমাবিহীন। বাঁশের কুঁড়েঘরগুলো অন্ধকার। শুধু বিষাদ আর বেদনায় ভরা। বাতাসে শুকনো মাছের গন্ধ। গ্রামের পুকুর সবুজ শ্যাওলায় ছাওয়া। ধানের খেতে থমকে আছে বদ্ধ পানি। উঁচু উঁচু তালগাছগুলো সবকিছু ছাপিয়ে আকাশ-সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বত্র বুকভরা ভাষাহীন বেদনা আর নিস্তব্ধতা, জড়তা আর মৃত্যুর আভাস। আর যে বেদনা ও হতাশা আমাদের প্রেমে, আমাদের সমাজে, সাহিত্যে-সংগীতে দেখতে পাও, তার জন্ম আমাদের এই গ্রামে। তারপর সেখান থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম যখন তাকে দেখি, আমার চোখে তাকে জলপরির মতো অপরূপ সুন্দরী মনে হয়েছিল। সে সমুদ্রে সাঁতার কাটছিল। সাগরতীরে একটা নতুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আমি বালুর তীর ধরে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা মিষ্টি মেয়েলি গলার ডাক শুনলাম, 'আমি উঠব, সরে যান ওখান থেকে।' সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এল কথা কটি। ঝিকমিক করা কালো চুল আর জলপরির মতো

একটা হাসিভরা মুখ। আর বেশ দূরে দিগন্তরেখা বরাবর একটা নৌকা। সূর্যের আলোয় রুপোর পাতের মতো তার সাদা পাল সোনালি পাতের মতো ঝিকঝিক করছিল।

আমি বললাম, 'তুমি কি সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এসেছ?'

সে হেসে বলল, 'না, এই পাশের গ্রামেই থাকি। এটা আমার বাবার নৌকা। মাছ ধরতে গেছেন। আর আমি তাঁর জন্য ভাত নিয়ে এসেছি। ওই যে তালগাছটা দেখছ, ভাতের থালিটা ওখানেই রাখা আছে। আমার শাড়িও আছে ওখানে।'

এ কথা বলেই ঝলমলে বুদ্‌বুদের রেখা তুলে সাগরজলে ডুব দিল সে। তীরের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'দয়া করে এখান থেকে সরে যান। আর শাড়িটা আমার দিকে ছুড়ে দিন।'

'কিন্তু একটা শর্তে,' আমি বললাম।

'কী শর্ত', মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'তোমার আনা ভাত-মাছ আমিও খাব। দারুণ খিদে পেয়েছে আমার।'

সে হেসে উঠল। তারপর মুক্ত জলপরির মতো পানির বুক চিরে দূরে ছুটে গেল ঠিক যেখানে নীল সমুদ্রে সূর্য আলোর জাল বুনছিল। তারপর সে ফিরল। তীরের দিকে এল সাঁতার কেটে। কিন্তু এবার এল ধীরে ধীরে, ছোট্ট এক কিশোরীর মতো খেলা করতে করতে।

'তোমার কী হলো,' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আজকাল চাল বড় আক্রা। টাকায় মাত্র দু'সের। ভাত খেতে দিতে পারব না।'

'তাহলে আমি কী করব! আমার তো ভীষণ ...।'

'তাহলে লোনা পানি খান,' সে ঠাট্টা করে আবার সমুদ্রের পানিতে ডুব দিল।

আমার ঘরে বউ হয়ে সে যখন এল, টাকায় তখন দু'সের চাল

পাওয়া যেত। আমার মাইনে মাসিক পঞ্চাশ টাকা। বিয়ের আগে ভোরবেলা উঠতে হতো। রাঁধতে হতো নিজের হাতে। কারণ, জমিদারের মেয়ের স্কুল সকালে, তার আগেই তাকে সেতার শেখাতে হবে। সন্ধ্যাবেলা দুঘণ্টা গান শেখাতাম। দিনের বেলা যখন খুশি তখনই ডেকে পাঠাতেন জমিদার। বলতেন, 'বাজাও সেতার, মনটা বড্ড উদাস হয়ে আছে।'

তারপর এই পৃথিবীতে এল আমাদের ছোট্ট সন্তান...কাছে এসো মামণি...আচ্ছা একটু হাসি দেখিয়ে দাও ওদের। ওদের জানিয়ে দাও, 'আমি নিষ্পাপ। আমার বয়স দুবছরও হয়নি। আমি খেলতে চাই ঝুমঝুমি আর পুতুল নিয়ে। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে তার কোলেই ঘুমিয়ে থাকতে চাই। আমি এত নিষ্পাপ যে নিজের কথা বলতেও শিখিনি। আমি শুধু জানি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে, যেখান থেকে মা-বাবার ঘর হাসিতে আলো করে তুলতেই ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন এই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরখানা আমার কচি হাসিতে ভরিয়ে তুলতে।'

এসো লক্ষ্মী মা আমার। ওদের একটু হাসি দেখিয়ে দাও।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, এই মেয়ে যখন পয়দা হলো তখন টাকায় এক সের চাল। তবু আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছি, যার দয়ায় ধান জন্মায়, আর জমিদারের কৃপায় সেই চালের ভাত খেতে পাই।

আসল কথা হলো, এই ফসল ফলানো আর খাওয়ার ইতিহাসের মাঝখানের ইতিহাস, মানুষের জীবনের হাজার বছরের ইতিহাস, তার সংস্কৃতি, তাহজিব, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যের খাঁটি ব্যাখ্যা। ফসল জন্মানো আর খাওয়া—দুটিই খুব সোজা ব্যাপার। কিন্তু একবারও এই দুটি শব্দের গভীর সংজ্ঞা আর তাদের মধ্যকার ব্যবধানের বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেছ?

টাকায় এক সের চাল। তারপর হলো টাকায় তিন পোয়া। তারপর আধসের। তারপর এক পোয়া। তারপর বাজার থেকে চাল উধাও। গাছের ফল নিঃশেষ। তরিতরকারি, মাছ, শাকসবজি, নারকেল পর্যন্ত নেই। লোকে বলাবলি করত, জমিদারের কাছে নাকি অনেক চাল জমা আছে। কিন্তু কোথায়, কেউ জানে না। চালের জন্য অনেক কিছু করা হলো। অনুনয়-বিনয়, আবেদন-নিবেদন, তোষামোদ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এমনকি ভগবানকে অভিশাপ দেওয়া পর্যন্ত বাদ গেল না। সবই করে দেখা হলো কিন্তু কোনো ফল হলো না। সবই গেল, থাকল ভগবানের নাম, মহাজনের আড়ত আর জমিদারের কাছারি।

দুর্ভিক্ষ দেখে জমিদার সেতার শেখানো বন্ধ করে দিলেন। অনাহারে মানুষ মরছে, কে শুনবে গান? সেতার শেখাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা করে কে খরচ করবে? ক্ষুধা, হতাশা আর একটি দুধের শিশু। বউকে বললাম, 'চলো, কলকাতা চলে যাই। সেখানে লাখো মানুষের বসবাস। সেখানে হয়তো একটা কাজ পেয়ে যেতেও পারি।'

'চলো যাই কলকাতা।'

'চলো যাই কলকাতা।'

যেন পুরো গাঁ এই সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছে। গ্রামের মানুষের মধ্যে অটুট বন্ধন গড়ে উঠল কিন্তু 'কলকাতা চলো' রব সেই বন্ধনেও ধরিয়ে দিল ফাটল। সমস্ত মানুষ ছুটে চলল স্রোতের মতো। 'কলকাতা চলো'—সবার মুখে এই একটিমাত্র কথা। 'চলো, কলকাতা চলো।'

নিয়তির ওপর নির্ভর করে হাজার হাজার মানুষ সড়কপথ ধরে এগিয়ে চলল। এই পথ বাংলার সীমান্ত জেলাগুলোর ওপর দিয়ে গিয়ে অবশেষে কলকাতায় এসে শেষ হয়েছে। কলকাতা অভিমুখে

স্রোতের মতো এগিয়ে চলা মানুষজনের কাছে একমাত্র আশাভরসা এই পথ।

'চলো কলকাতা'...পিঁপড়ে বাহিনীর মতো গুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে অন্নের সন্ধানে আধমরা সব মানুষজন। চলেছে কলকাতার উদ্দেশে...যেন মৃত্যুর মিছিল। মাথার ওপরে পাক খেয়ে ঘুরছে অলক্ষুনে শকুন-শকুনির পাল, যাদের খাদ্যের অভাব নেই। বাতাসে গলাপচা মাংসের গন্ধ, মেয়েদের হাহাকার আর শিশুদের কান্না। প্লেগে মরা ইঁদুরের মতোই শকুন, শেয়াল আর বন্য কুকুরের জন্য মৃতদেহগুলো যেন পথের দু'ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার পরও পিঁপড়ের মতো মানুষ এগিয়ে চলেছে। তারা এসেছে বাংলার প্রতি প্রান্তর থেকে। সবারই গন্তব্য কলকাতা। 'চলো কলকাতা! কলকাতা চলো।'

কে কাকে সাহায্য করবে? কেমন করেই-বা করবে? প্রত্যেক মানুষ জৈবিক প্রয়োজনে নিজের নিজের জান বাঁচানোর জন্য আদিম বর্বরতায় ফিরে গেছে। হতাশা, ক্ষুধা আর মৃত্যুকে সঙ্গী করে মানুষ নামের এই পিঁপড়ের দল ছুটে চলেছে ক্লান্তির ভারে পা ফেলতে ফেলতে। জীর্ণ-শীর্ণ দেহটাকে কোনোমতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। নিজেদের মধ্যে নিজেরা মারামারি করছে, কাতরাচ্ছে, আর্তনাদ করছে, কাশির সঙ্গে উঠে আসছে রক্তের দলা, তারপর শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তাদের মধ্যে পিঁপড়ের দলের মতো নিয়মের বালাই আর সহিষ্ণুতাটুকুও যদি থাকত! পিঁপড়ে আর ইঁদুরও এমন বীভৎসভাবে মরে না।

চলতিপথে এখানে-সেখানে খয়রাত মিলছে। হিন্দুরা হিন্দুদের আর মুসলমানরা মুসলমানদের ভিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু খয়রাতে তো আর সমস্যার সমাধান হয় না, প্রাণ কি কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে? এ প্রতারণার শামিল একটা ব্যাপার। যে

দেয় সে যেমন নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে, তেমনি যে নেয় সে-ও প্রতারিত হয়।

আমিও কখনো কখনো ভিক্ষে পেতাম। একদিন পেলাম একটা আস্ত নারকেল। মেয়েটা কত দিন ধরে দুধের জন্য কাতরাচ্ছে! আর তার মায়ের বুক এখন শুকিয়ে মরুভূমি। কত দিন ধরে যেন তাতে একফোঁটা পানিও পড়েনি। তার দেহ যেন জীর্ণ শুকনো একটা ফুল। মেয়েটার কান্না থামানোর জন্য তার হাতে গুঁজে দিতাম ঝুমঝুমিটা। এই কাঠের খেলনাটা ছিল তার আদরের বস্তু। শক্ত মুঠোয় বুকে আঁকড়ে ধরত সেটা। সেদিনও তার হাতে ছিল ওই ঝুমঝুমিটা। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে করুণ মুখে কাঁদছিল। ভয়ার্ত আহত পশু যেমন করে কাতরায়, তেমনি করে। মরণ এসে যতক্ষণ না সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত চলে তার এই কান্না।

বলছিলাম, সেদিন কাটিয়েছি পুরো একটা নারকেল দিয়ে। নারকেলের পানি দিলাম মেয়েটাকে আর নিজেরা খেলাম শাঁসটুকু। মুহূর্তের জন্য মনে হলো পৃথিবীটা যেন আবার নতুন করে জন্ম নিয়েছে।

'গন্তব্য কলকাতা'। সেই অফুরন্ত দীর্ঘপথ ধরে এগিয়ে চলেছি। আমাদের প্রত্যেকের ঝুড়ি শূন্য, কারও হাতে কিছু নেই। যার হাতে যা ছিল হয় বিক্রি করে দিয়েছে নতুবা অদল-বদল করেছে। বাকি আছে শুধু মানুষের ব্যবসা। উত্তর ভারত থেকে এসেছে মানুষ কেনার খদ্দের। তাদের মধ্যে আছে অবলা আর অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার। তাদের চাই শুধু অবলা আর অনাথদের। বাপ-মায়েরা 'অনাথ' বলে নিজেদের হাতে সন্তানকে তুলে দিচ্ছে ম্যানেজারের হাতে। গরিব ঘরের শিশুরাই হলো অনাথ। তাদের বাবা-মা বেঁচে আছে কিংবা মরে গেছে, সেটা এখন একেবারেই

গৌণ ব্যাপার। এদের মধ্যে মানুষের সত্যিকার ব্যবসায়ীও রয়েছে, যাদের কাছে নীতির কোনো বালাই নেই, ধর্মের নামে ধাপ্পাবাজি নেই, যারা ধার ধারে না কোনো সামাজিক অজুহাতের। হাটের ভেড়ার মতো মেয়েগুলোকে যাচাইবাছাই করে তারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

'খাসা মাল দেখছি।'

'রংটা একটু কালো।'

'বড্ড কাহিল।'

'মুখে আবার বসন্তের দাগ।'

'আরে মাংস কই, গা-জুড়ে শুধুই হাড়গোড়।'

'থাক, ওতেই চালিয়ে নেওয়া যাবে।'

'দশ টাকা দিয়ে দাও।'

স্বামী বিক্রি করছে স্ত্রীকে, মা বেচে দিচ্ছে মেয়েকে, ভাই বিক্রি করে দিচ্ছে বোনকে। অথচ যখন তাদের অবস্থা ভালো ছিল, তখন এসব পতিতালয়ের দালালরা এ ধরনের কোনো ইঙ্গিত করলে তাদের তারা সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলত। কিন্তু আজ তারা ঘরের মেয়েদের শুধু বেঁচেই দিচ্ছে না, বিক্রির জন্য খরিদ্দারকে রীতিমতো তোষামোদ করছে। মাত্র একটা পয়সার জন্য পর্যন্ত দর-কষাকষি করছে। ধর্ম, আদর্শ, মায়া-মমতা, নীতি, জীবন—মানবতার সব আদর্শ—সবকিছু আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। জীবন তার জৈবিক নগ্নরূপে মূর্ত, ক্ষুধার্ত, নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর হিংস্র পশুর মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

বউ বলল, 'আমার মেয়েটিকেও বিক্রি করলে কেমন হয়?' ভয়ে লজ্জায় মাটির দিকে তাকিয়ে সে কথাগুলো উচ্চারণ করে নীরব হয়ে গেল। আড়চোখে সে একবার তাকায় আমার দিকে। তার কথায় আমার কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখার জন্য তাকিয়ে

থাকে। তার দৃষ্টিতে অপরাধীর লজ্জা, যেন সে নিজে তার মেয়ের গলা টিপে হত্যা করছে, যেন সে নিজের হাতে নিজের গলায় ফাঁসির রশি পরে তাতে গিঁট দিয়ে আত্মহত্যা করছে।

আমার কোনো অভিযোগ নেই, কারণ, আজ সে মারা গেছে। যখন সে ও-কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, তখনই তার মৃত্যু হয়েছে। কিংবা ও-কথা মুখে উচ্চারণ করার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আজও, তার মৃত্যুর পরও আমি বুঝতে পারি না, তার মুখ দিয়ে কেমন করে এমন কথা বের হয়েছিল, কেমন করে এ সম্ভব হলো? কোন ধরনের দানবীয় শক্তি তার মমতাকে হত্যা করেছিল? তার আত্মাকে চূর্ণ করে দিয়েছিল? আজও আমার মনে পড়ে, তার কোল থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। কিন্তু আমার ক্রোধ আর বিরক্তি তাকে স্পর্শ করেনি। আমার পেছনে পেছনে লেংড়াতে লেংড়াতে, কলের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিল। ধুলোয় তার রুক্ষ চুলে জট ধরেছে; শাড়িখানা শতচ্ছিন্ন, ডান পায়ের জখম ফেটে রক্ত ঝরছে। তার সেই চোখ, তিন বছর আগেকার সেই জলপরি আজ কোথায়? কোথায় সেই লাবণ্যময়ী বাঙালি, যাকে দেখেছিলাম জলপরির মতো সমুদ্রে সাঁতার কাটতে? ফুলের মতো অনুপম রূপ যার মধ্যে জড়ো হয়েছিল, উজ্জ্বল করে তুলেছিল যাকে তাজমহলের মর্মরের মহিমা, ইলোরার সৌন্দর্য আর অশোকের শিলালিপির অমরত্ব—কোথায় সেই রূপ ও সৌন্দর্য?

সে আজ কোথায় উধাও? আজ সেই ফুলের মতো এই রূপ, প্রাণ, এই মমতাময়ী দেহ পথের ধুলোয় দলিত-মথিত লাশের মতো পড়ে আছে? যদি সত্যি হয় যে নারী এক পরম বিস্ময়, যদি সত্যি হয় যে নারীই জীবন, নারীই তার ভবিষ্যৎ, নারীই উৎস, জীবনের সত্য, তাহলে বলতে হয় যে, এই সত্য, এই বিশ্বাস, এই

বিস্ময়ের উৎস এককণা চাল থেকে উৎসারিত, যা না হলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

জলপরি আমার কোলে মাথা রেখে অন্তিম নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার ধুলোমাখা নোংরা ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে পথের ধারেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল। বারকয়েক হিক্কা তুলল। তার পরই ছাড়ল তার অন্তিম নিঃশ্বাস। তার মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। দুঃখ কেবল এজন্য যে কীভাবে তার মাতৃত্বের মমতার মৃত্যু হলো, যে মমতাকে আমরা চিরস্থায়ী বলে থাকি।

জানি না কেন, কীভাবে তা-ও বলতে পারব না—মনে ভেসে উঠল অতীত দিনের স্মৃতি, যখন তাকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম, আর তার দেহের গন্ধ মনে করিয়ে দিয়েছিল জুঁইফুলের সুবাসকে। তার মৃত্যুর মুহূর্তেও সেই একই সৌরভ যেন আমার নাকে ভেসে এল। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তার মরা ঠোঁট দুটোর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলাম। অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল তার ঠোঁট দুটোর ওপর, তার চোখ আর গালের ওপর। মাত্র উনিশ বছরে না খেয়ে, সীমাহীন তৃষ্ণা বুকে নিয়ে, ধুলোমাখা দেহে, শতজীর্ণ কাপড়ে, সে আমার কোলে মরে পড়ে আছে। সেই জলপরিকে মরার পর আজ কেন জানি ডাইনির মতো দেখাচ্ছিল। মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, ভগবানের বিরুদ্ধেও নয়। নেই সেই পথের অন্ধ মিছিলের বিরুদ্ধে, এমনকি কারও বিরুদ্ধেই আমার কোনো অভিযোগ নেই। শুধু ভাবি, যদি এমনি করে তাকে মরতে না হতো! আমি একজন মানুষ না, শুধু বন্ধু হিসেবে, ভগবানের কাছে তার একজন অনুসারী হিসেবে জানতে চাই, সে এমন কী পাপ করেছে, যার জন্যে তাকে বরণ করতে হলো এই পরিণাম? বেঁচে থাকলে হয়তো সে সাদামাটা জীবন যাপন করত।

ছোট একটা ঘর, স্বামী আর সন্তান, সাধারণ জীবনের সাদামাটা সুখ—এ নিয়ে যদি সে সাধারণ মানুষেরই মতো পুরোটা জীবন বেঁচে থাকত, তাহলে কার কী ক্ষতি হতো? এ রকম লাখ লাখ মানুষ আছে, যারা জীবনে বেশি কিছু আশা করে না, মান চায় না, ধন, সাম্রাজ্য কিংবা প্রতিপত্তি চায় না, অথচ এই সামান্য সুখ থেকেই তারা বঞ্চিত। সে-ও এই একই রকম বঞ্চনার শিকার ছিল। এমনভাবে তাকে কেন মরতে হলো? যদি মরতেই হয়, তাহলে তার নিজের গ্রামে, সমুদ্রের তীরে, নারকেলের ডালে কাঁপা বাতাস দেখে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলতে পারল না কেন? এ রকম জঘন্যভাবে কেন তাকে মরতে হলো? যেখানে চারদিকে জীবিতের কাতরানি; শ্রান্ত, ক্লান্ত পা ফেলার শব্দ আর পদচিহ্ন, মৃত্যু তেমন মানুষের অরণ্যে বহুদূর থেকে ভেসে আসা ক্ষুধার্ত কুকুরের কান্নার শব্দ ছাড়া আর কী! আমি তাকে কবর দিইনি। তাকে পুড়িয়েও আসিনি। তাকে রাস্তার পাশে ফেলে রেখেই মেয়েটাকে বুকে ধরে চলে এসেছি।

এখনো কলকাতা অনেক দূরে—মেয়েটি এ কয়দিন কিছুই খায়নি। সে ক্ষুধার্ত। সে আর কাঁদতেও পারে না। তার গলা থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। পানি থেকে ডাঙায় তোলা মাছের মতো ঠোঁট দুটো ফাঁক করা আর শব্দ করার শক্তিটুকুও তার নেই। পানির ওপরে মাছ ভেসে উঠে পানি পানের জন্য যেভাবে ঠোঁট হাঁ করে থাকে, সে-ও ঠিক সেইভাবে বারবার তার মুখ খুলতে থাকে। এই ছোট্ট জলপরির হাতে তখনো ধরা ছিল কাঠের সেই ঝুমঝুমিটা। নিষ্প্রভ প্রদীপের মতো আমার চোখের সামনে মরে যাচ্ছে অথচ আমার করার কিছুই নেই; আমি তখনো এগিয়ে যাচ্ছি। আমার সামনে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে মানুষ আর মানুষের ঢল। ওরা এগিয়ে চলেছে মৃত্যু উপত্যকার দিকে। প্রত্যেকেই যেন

নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; প্রত্যেকেই পার হয়ে চলেছে সেই মৃত্যুময় বন্ধুর উপত্যকা। প্রত্যেক জোড়া চোখে, প্রত্যেকটি মুখে পড়েছে একই ছায়া...আমি হাত জোড় করে প্রার্থনা জানালাম, হে বিধাতা, হে আকাশ ও মাটির স্রষ্টা, এই নিষ্পাপ শিশুটির দিকে একবার চোখ তুলে তাকাও।...জগতের প্রভু, হে অন্নদাতা, তোমার দরবারে, তোমার রাজত্বে একফোঁটা দুধ, কিংবা একমুঠো অন্নও জুটবে না এই শিশুটির কপালে? চেয়ে দেখো, এর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, কেমন করে শুকনো মুখখানা হাঁ করছে আর তার পরই হয়তো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ফলে সে থেকে থেকেই ছটফট করছে। দেখো, ক্ষুধার জ্বালায় তার শরীরটা বেঁকে যাচ্ছে। হে ভগবান, তুমি বলেছ মরণ নাকি সুন্দর। কিন্তু নিশ্চয় এ মরণ সুন্দর নয়। এই শিশুর অনেক ভালোভাবে মরা উচিত ছিল। হে ধ্বংসের দেবতা, এই আধফোঁটা কুঁড়িকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য একটা ঝলমল করা বুদ্‌বুদের মতো, ঢেউয়ের বুকে দুলতে থাকা নৌকার মতো, নারকেলের গাছের সারির ছায়ায় প্রথম চুম্বনের মতো এই অপরূপ স্বপ্নকে কেন তুমি চুরমার করে দিতে এত উদ্‌গ্রীব? হে নিষ্ঠুর অন্ধ বিধাতা, এর কি কোনো দাম নেই!

প্রার্থনা কিংবা অভিশাপে কোনো ফলই হয় না। আমার মেয়েও কী রকম ধড়ফড় করে মারা গেল! তার সেই শেষ মুহূর্তের ভয়াবহ যাতনা আমি চোখে দেখেছি। আমার এই মৃত পাথরের মতো চোখ দুটোকে জিজ্ঞেস করো, তারা বলবে, কতটা ভয়াবহ দৃশ্য তাদের দেখতে হয়েছিল! একফোঁটা দুধের জন্য কঁকিয়ে কঁকিয়ে সে মারা গেল। আকাশ থেকে একফোঁটা দুধও ঝরে পড়ল না। মাটির বুক চিরে একফোঁটা দুধ উঠে আসেনি। চেতনাহীন আকাশ। নিষ্ঠুর সড়ক। আর সামনে এই দীর্ঘ প্রাণহীন নির্মম পথ।

মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে সে হাতের ঝুমঝুমিটা আমাকে দিয়েছিল। সেটা এখনো আমার হাতের মুঠোয় ধরা। তার এই সম্পদ সে আমাকে দিয়ে গেছে। না, সে এমন সরল বিশ্বাসে আমার হাতে ওটা দিয়েছিল যে আমার বিশ্বাস, সে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে গেছে। আমাকে দিয়ে গেছে পুরস্কার। সস্তা একটা কাঠের ঝুমঝুমি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যদি সে ক্লিওপেট্রা হতো, তাহলে আমাকে দিত তার সমস্ত প্রেম, যদি সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল হতো, তাহলে আমাকে দান করত তাজমহল, যদি রানি ভিক্টোরিয়া হতো, তাহলে আমাকে দিয়ে যেত তার সমগ্র রাজত্ব। কিন্তু ছোট এক অভাগা গরিব শিশু, তার ছিল মাত্র একটা কাঠের ঝুমঝুমি। তা-ই সে দিয়ে গেছে তার সর্বহারা পিতাকে। এমন কে আছে যে এই কাঠের খেলনার দাম যাচাই করতে পারে? তোমরা যারা ধনী, মানুষের কাছে তুচ্ছ ত্যাগের ঢাকঢোল পেটাও, তারা নিয়ে যাও এই কাঠের ঝুমঝুমি। একে প্রতিষ্ঠা করো মানবতার মন্দিরে, যে মন্দির আজ থেকে হাজার বছর পর একদিন তোমাদের সকলের জন্যে আমার আত্মাকে গড়ে তুলবে।

অবশেষে কলকাতা পৌঁছালাম। ভুখা, বিরান, নির্দয় নগরী। হৃদয়হীন, নির্মম কলকাতা নগরী। নেই আশ্রয়, নেই একমুঠো অন্ন। শিয়ালদা স্টেশন, শ্যামবাজার, বড়বাজার, হ্যারিসন রোড, জাকারিয়া স্ট্রিট, বৌবাজার, সোনাগাছি, নিউ মার্কেট, ভবানীপুর—কোথাও এককণা চালও মেলেনি। কোথাও মানুষকে কেউ মানুষ বলে গণ্য করে না। ক্ষুধার্ত মানুষ অভিজাত হোটেলের সামনে মরে পড়ে আছে। একই ডাস্টবিনে কুকুর আর মানুষ খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। উচ্ছিষ্টের অংশ নিয়ে মানুষে কুকুরে চলছে লড়াই। আর সড়ক ধরে বিপুলাকার মোটরগাড়ি ছুটে যায়। তার ভেতরে যারা, তাদের ঠোঁটে হাসির ফোয়ারা।

নগ্ন উপবাসী দেহের বেরিয়ে পড়া পাঁজরের হাড়গুলোকে মনে হয় যেন তারা লোহার শেকলে বন্দী। সেই শেকলে ওরা প্রাণকে বেঁধে রেখেছে? বন্দীত্ব থেকে বেরিয়ে পড়ুক সেই প্রাণ। এই কারাগারের দরজা খুলে দাও। এই সময় দ্রুতবেগে আরেকটা মোটরগাড়ি ছুটে যায়। কিন্তু দেহ তো আত্মার কান্না শোনে না।...মা মরছে, ছেলেরা ভিক্ষে করছে। স্ত্রী মরছে আর স্বামী ঘ্যানর ঘ্যানর করছে—রিকশায় যাতায়াতকারী সাহেবের কাছে পয়সা ভিক্ষা চাইছে। যুবতী মেয়েটি একেবারে উলঙ্গ। কিন্তু তার খেয়ালই নেই যে সে উলঙ্গ কিংবা যুবতী। এমনকি তার খেয়াল নেই যে সে একজন নারী। সে শুধু জানে যে সে ক্ষুধার্ত আর এটা হলো কলকাতা শহর। ক্ষুধা সৌন্দর্যকে পর্যন্ত হত্যা করেছে।

আমি একটি দূতাবাসের সিঁড়ির গোড়ায় শুয়ে মরছি। পড়ে আছি বেহুঁশের মতো। কারা যেন কাছে এসে দাঁড়াল। তারা আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ কানে এল অস্পষ্ট ফিসফিসে স্বরে এই কথাগুলো, 'হারামিকে মনে হচ্ছে হিন্দু। চলো এগিয়ে যাই।' ওরা চলে গেল। অন্ধকার ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে।

আবারও কেউ যেন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমাকে আপাদমস্তক দেখে ফিরে দাঁড়াল, 'কে তুমি?' একজন পথচারী জিজ্ঞেস করে। খুব কষ্টে ভারী ঠোঁট দুটো তুলে চোখ খুলে উত্তর দিলাম, 'আমি একজন ক্ষুধার্ত মানুষ।'

'শালা, দেখতে একেবারে মুসলমানের মতো।' এ কথা বলে ওরাও চলে গেল।

ক্ষুধা ধর্মকে পর্যন্ত হত্যা করেছে।

এখন চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। আলোর চিহ্নমাত্রও নেই। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ আনন্দ শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল মন্দিরে মন্দিরে, গির্জায় গির্জায়। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল মধুর আনন্দসংবাদ। খবরের কাগজ হাতে হকার চিৎকার করছে দিনের সেরা খবর : 'তেহরানে ত্রিশক্তির বৈঠক। নেতৃবৃন্দের ঘোষণা...নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি, নতুন পৃথিবীর জন্ম।'

আনন্দ-বিস্ময়ে আমার চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি নিথর হয়ে গেল।

ঠিক ওই সময় থেকেই বিস্ময়ে আমার চোখজোড়া খোলা।

আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি একজন সেতারবাদক। আমি শাসক নই; কিন্তু যারা শাসন মেনে চলে, আমি তাদেরই একজন। কিন্তু কোনো দরিদ্র গায়কের হয়তো প্রশ্ন করার এই অধিকার আছে যে এই দুনিয়ায় আমাদের মতো হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ, যারা দরিদ্র, যারা ভুখানাঙ্গা, যারা শোষিত, তাদেরও কি কোনো ভূমিকা থাকবে এই নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে?

আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, কারণ, ত্রিশক্তির নতুন জগতে আমি বাঁচতে চাই। আমি যুদ্ধ ঘৃণা করি, ঘৃণা করি ফ্যাসিবাদ। ঘৃণা করি অত্যাচার আর অন্যায়কে।

আমি রাজনীতিক নই। কিন্তু একজন সেতারবাদক হিসেবে এটুকু বুঝি, যে গানে বেদনার সুরের ছোঁয়া আছে, সে গান শ্রোতাকেও ব্যথিত করে তোলে। যে মানুষ ক্রীতদাস, সে অন্যকেও দাস করে তোলে। পৃথিবীর পাঁচজনের একজন মানুষ হচ্ছে ভারতীয়। যে শৃঙ্খলে প্রতিটি ভারতবাসী বাঁধা, পৃথিবীর বাকি চারজন মানুষ তার জন্য ব্যথা পায় না, এ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সেতারে একটা বেসুরো তার থাকে, ততক্ষণ সমস্ত রাগিণী বেতালে বাজতে থাকবে। যত দিন একজন মানুষও অনাহারে থাকবে, তত দিন পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী

অনাহারে থাকবে, যত দিন একটি মানুষও দরিদ্র থাকবে, প্রত্যেকেই তত দিন পর্যন্ত দরিদ্র থাকবে। যত দিন একটি মানুষও পরাধীন থাকবে, এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ তত দিন পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

তাই আমার প্রশ্ন, কখনো ভেবো না যে আমি মরে গেছি। যদি মরতে হয়, তাহলে তুমিই মরেছ। আমি বেঁচে আছি। আর সর্বক্ষণ আমার এই মৃত দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে এই একটি কথাই জিজ্ঞাসা করব, তোমার ঘুমে আমি হানা দেব। তোমার মধুর স্বপ্নকে আমি রাতের বিভীষিকায় পরিণত করব। আমি তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলব। তুমি কোনো পথ ধরে চলতে পারবে না। তুমি খেতে পারবে না। তুমি কাজ করতে পারবে না। তোমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। যত দিন আমার মনের মতো উত্তর না পাব, তত দিন আমার মৃত্যু নেই। আমি মরতে পারি না।

আমার এই প্রশ্ন পৃথিবীর বুকে বাঁচার জন্য নয়। তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, কারণ, পথের ধারে আমার বউ জলপরিকে ফেলে এসেছি, তাকে সৎকার পর্যন্ত করতে পারিনি। আর এখনো আমার ছোট্ট সেই মেয়ের হাতে ধরা রয়েছে কাঠের সেই ঝুমঝুমিটা।